সাধু ও সাধক

গজেন্দ্রকুমার মিত্র

মণ্ডল বুক হাউস ॥ ৭৮/১, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ
শুভ ১লা বৈশাখ ১৩৬০ সন
প্রকাশক
শ্রীসুনীল মণ্ডল
৭৮/১ মহাত্মা গান্ধী রোড
কলকাতা-৯
প্রচ্ছদপট
শ্রীগণেশ বসু
ব্লক
স্ট্যাণ্ডার্ড ফটো এনগ্রেভিং কোং
কলকাতা-৯
প্রচ্ছদ মুদ্রণ
ইম্প্রেসন্ হাউস
৬৪ সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট
কলকাতা-৯
মুদ্রক
শ্রীঅজিতকুমার সাউ
নিউ রূপলেখা প্রেস
৬০ পটুয়াটোলা লেন
কলকাতা-৯।

উৎসর্গ

সেবাব্রতী প্রবীণ সাধু
স্বামী বরেশানন্দ
স্বামী প্রসন্নানন্দর

করকমলে

॥ সূচী ॥

আমাদের প্রকাশিত
লেখকের অন্য বই :

সাধুসঙ্গ
প্রেয়সী ও শ্রেয়সী
তৃতীয় রিপু
জলে দেখি জোনাকি

সাধনা ও সিদ্ধি

বৃন্দাবনে সিদ্ধেশ্বরী বাগে যে কোনো উৎসব ঘোষিত হলেই ব্রজবাসী তথা স্থানীয় বাঙালী মহলে বেশ একটু উৎসাহ দেখা দিত।

তার কারণটা অবশ্যই স্থূল।

এই আশ্রম ও মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীশ্রী স্বামী মহেশানন্দ ভারতীর মেজাজ ও দৃষ্টি কিছু রাজকীয়। এখানের মতো ভাণ্ডারা এই আশ্রম-মঠ-বহুল তীর্থস্থানেও দুর্লভ। সাধারণ পূজাপার্বণ উপলক্ষে যে সব উৎসব যাতে সাধুদের সঙ্গে অসাধু অর্থাৎ সাধারণ বাঙালী (অধিবাসী আগ-স্তুক দুইই), সম্ভ্রান্ত ব্রজবাসী এবং মহান্তরাও নিমন্ত্রিত হন, তাতে কেউই নেহাত অসুস্থ হয়ে না পড়লে অনুপস্থিত থাকেন না। কারণ নিরামিষ বিরিয়ানী থেকে শুরু করে আলুর কোর্মা, পটলের দোলমা, বেগুনের কোর্মা, ভেজিটেব্‌ল চপ, ধোঁকা, ছানার ডালনা প্রভৃতি বিপুল আয়োজন থাকে। তার সঙ্গে কলকাতার কারিগর আনিয়ে রসগোল্লা দরবেশ পান্তুয়ার সমারোহ। বিশুদ্ধ গো দুগ্ধের পরমান্ন ভোজ্য তালিকায় সব-গুলিই উপাদেয় ও লোভনীয়। লুচি, কচুরি পোলাও (মাংসের স্বাদ ছানায় মেটাতে হয়) প্রভৃতি তৈরী হয় সবই উৎকৃষ্ট ঘৃতে। মহেশানন্দ ভারতী এমন ভোজ দেন যার স্মৃতি দীর্ঘকাল নিমন্ত্রিতদের মনে থাকে। তারও কারণ আছে। মহেশানন্দর শিষ্য সংখ্যার মধ্যে ধনী পাঞ্জাবী ও মাড়োয়ারীর সংখ্যাই সমধিক। আর তার কারণ—মহেশানন্দ সাধক হিসেবে (ছোট কি বড় তা আমাদের জানার উপায় নেই) যত বিখ্যাতই হোন, চিকিৎসক হিসেবে বোধহয় আরও বিখ্যাত। হোমিও-প্যাথী, কিছু টোটকা এবং আয়ুর্বেদী ঔষধের গুণাগুণ তার কণ্ঠস্থ।

এত বড় তীর্থে, বারোমাসে তের পার্বণ সেখানে লেগেই আছে, বিশেষ হোলি-ঝুলন-অন্নকূটে অসংখ্য যাত্রী সমাগম সেখানে অনিবার্য। আর এত লোকের মধ্যে কিছু অসুস্থ হয়ে পড়বেনই। বিশেষ ধনীদেরই মহা-

মারীর আতঙ্ক বেশী—সেক্ষেত্রে লোক-পরম্পরায় মহেশানন্দর আশ্চর্য শক্তির কথা শুনে তাঁর কাছেই ওরা ছুটে আসবে এও স্বাভাবিক।

আর যার একমাত্র পুত্র কি দুলালী কন্যা ভয়াবহ ব্যাধি (এদের ব্যাধি মাত্রেই ভয়াবহ বোধহয় বাবা মায়ের কাছে) থেকে পরিত্রাণ পায় সে চিরদিনের জন্য মহাত্মার পায়ে বিকিয়ে থাকবে এও জানা কথা।

এরা এখানে উৎসব কি ভাণ্ডারার সংবাদ পেলে মোটা অঙ্কর টাকা, ঝুড়ি ঝুড়ি ফল বা অসময়ের সব্‌জি, টিন টিন যথাসম্ভব বিশুদ্ধ ঘি পাঠিয়ে দেন। সারারাত্রি লরী চালিয়ে খাঁটি দুধ আসে বড় বড় ড্রাম ভর্তি হয়ে। কাজেই রাজকীয় সমারোহের (মাছ মাংসের ব্যবস্থা থাকলে বলা যেত বাদশাহী) কোনো অসুবিধাই হয় না এ আশ্রমে। অষ্টভুজা সুবর্ণময়ী মা সিদ্ধেশ্বরীকে প্রতিদিন যে ভোগ নিবেদন করা হয় তাও বলতে গেলে রাজভোগ। সুতরাং উৎসবের দিনে আয়োজনটা সেই অনুপাতেই বৃহত্তর হবে বৈ কি।

তবে আমরা যে দিনের কথা বলছি সেদিনের উৎসব উপলক্ষটা বিশেষের মধ্যেও বিশেষ, বিশেষতম।

শ্রীশ্রী ১০৮ মহেশানন্দ ভারতী (এই অঙ্কটা এখন থেকেই চালু করা হলো) কদিন আগে সিদ্ধিলাভ করেছেন।

সাধক যেমনই হই, সিদ্ধিলাভ বড় সোজা কথা নয় বাবা, যারা দুম করে বলে বসে তাদের সিদ্ধি হয়েছে, তারা কি বলব, বলা উচিত নয় হয়ত মিছে কথা বলে। সিদ্ধি অর্থে ইষ্টের সঙ্গে ব্রহ্মের সঙ্গে একাত্মতা সে কি যার তার পক্ষে সম্ভব ?

জিনিষটি এত সোজা নয় বাবা সকল। এই তো দেখেছ, এতদিন ধরে এই কম্ম করছি, আঠারো বছরে সন্ন্যাস নিয়েছি, জটা-গোঁফ দাড়ি পেকে সাদা হয়ে গেল, গুরুর কৃপায় অসংখ্য শিষ্য এসে আশ্রয় করেছে আমি যদি মিছে কথা বলে নিজেকে সিদ্ধ বলে বানাতুম কেউ সন্দেহ করত ? না বাবারা, মিথ্যা সম্মানে আমার বড় ঘৃণা। ও আমি পারব না। আমার ব্রাহ্মণ শরীর, কুলীন ব্রাহ্মণের সন্তান ছিলুম পূর্ব শরীরে, মিছে কথা মুখে এখনও আটকায়।

এর পর সিদ্ধি সম্বন্ধে সংশয় থাকবে কেন ?

আর এই কঠিন সাফল্যের কথাটা লোক পরম্পরায় (ডাক যোগেও) ছড়িয়ে পড়ায় শিষ্যরা এক বিরাট উৎসব করবেন এর তো দুই আর দুইয়ের যোগফল চারের মতোই স্বতঃসিদ্ধ।

আয়োজনও অনেক। তিনদিন ব্যাপী উৎসব। বড় বড় পণ্ডিত আসবেন, বিহার, বঙ্গ, আসাম, উত্তরপ্রদেশের নামী নামী পণ্ডিত, বড় বড় মণ্ডলেশ্বর সন্ন্যাসী ; তাঁরা বক্তৃতা করবেন ধর্ম, ধর্মাচারণ, সাধনা ইত্যাদি সম্বন্ধে, কেউ বা গীতা ও শ্রীমদ্ভাগবতের নূতন ব্যাখ্যা করবেন। এই সব পাঠ ও বক্তৃতার মধ্যে উচ্চ দক্ষিণা ও উত্তম বিদায়ের কৃতজ্ঞতায় নিশ্চয় তাঁদের গুরুরও কিছু প্রশংসা করবেন। গুরু গৌরবের প্রচারে শিষ্যদের অকাতর অর্থ ব্যয় সার্থক হয়ে উঠবে। উচ্চকোটির সাধক না হলে এত সংখ্যক ধনী শিষ্য সম্ভবে না তা সাধু পণ্ডিত সকলেই বোঝেন। যথার্থ জ্ঞানী লোক তারা, সংসারের স্থূল ও প্রত্যক্ষ সত্যগুলো নিশ্চয় অজানা নেই।

এসব গতানুগতিক কর্মসূচী ছাড়াও কিছু ব্যবস্থা ছিল। এত বড় গুরুর উপযুক্ত অসামান্য কর্মতালিকা !

গুরুদেবের নামে একটি আধুনিক হাসপাতালের প্রতিষ্ঠা করা হবে, এই দিনটিকে চিহ্নিত করতে। ওঁকে তুলাদণ্ডে বসিয়ে সমপরিমাণ স্বর্ণ সংগৃহীত হবে, তাতেই অনায়াসে একটা হাসপাতালের প্রাথমিক কার্য শুরু করা যেতে পারবে। শিষ্যদের ইচ্ছা ছিল স্বয়ং মহেশানন্দজীই এই সিদ্ধেশ্বরী সেবায়তনের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন – ওঁর নামেই হাসপাতালের নামকরণেব ইচ্ছা ছিল। গুরুজীই দেবীর নাম প্রস্তাব করেছেন —তাতেও তিনি আপত্তি করেছেন। অন্যথায় উত্তরপ্রদেশের পূর্ত মন্ত্রীর নাম প্রস্তাবিত হয়েছিল– ভবনটি নির্মাণে কিছু আনুকূল্য পাওয়া যেত —সেটাও ওঁর মনঃপূত হয় নি। হরিদ্বার থেকে এক অতি বৃদ্ধ মহামণ্ডলেশ্বর আসছেন তাঁকে দিয়েই ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করানো হবে।

শিষ্যরা কেউ কেউ প্রথমটা এই আদেশ বা নির্দেশে কিছু ক্ষুণ্ণ হয়েছিলেন, পরে বুঝেছেন যে এতে করে তাঁদের গুরুর মহিমাই অধিকতর

বৃদ্ধি পাবে।

সব আয়োজনই প্রস্তুত, শিষ্যরা তুলাদানে কে কী অলঙ্কার দেবেত তা নিয়ে আলোচনা বিজ্ঞাপন ও প্রতিযোগিতা শেষ করে ফেলেছেন; ওয়াগন ও লরী বোঝাই করে এই বিপুল উৎসবের উপকরণ এসে পেঁীছোচ্ছে। পেঁীছে গেছেও অনেক—এমন সময় এই বিঘ্ন।

প্রথমে এত বোঝা যায় নি।

কে একটি ঘোর কৃষ্ণবর্ণ জটাধারী সন্ন্যাসী এসে (পরে শোনা গিয়েছিল ইনি দুর্গম তুষারাবৃত অঞ্চলে শীত বর্ষা সকল কালেই একেবারে উন্মুক্তস্থানে সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত দাঁড়িয়ে তপস্যা করেন বলেই গায়ের চামড়ার এই অবস্থা) উপস্থিত হলেন।

তার হাতে ভূর্জপত্রে লেখা একটি পত্র, গৈরিক বস্ত্রাংশ জড়ানো। তিনি যেনপরিচিতের মতো আশ্রমে ঢুকে দালান অতিক্রম করে সিঁড়ি বেয়ে অনায়াসে উপরে উঠে গেলেন এবং শিষ্যদের ভ্রূকুটি ও প্রশ্ন উপেক্ষা করে সোজা এগিয়ে গিয়ে মহেশানন্দকেই পত্রটি দিলেন।

এই ঘটনায় গুরুজীর মুখে পর্যায়ক্রমে যে ভাবান্তর বা বর্ণান্তর ঘটতে লাগল, তা অনেক শিষ্যই লক্ষ্য করেছেন।

প্রথমটা বিস্ময়ব্যঞ্জক ভ্রূকুটি। তারপরই আবরণ মুক্ত করে পত্রের প্রায় দুর্বোধ্য হস্তাক্ষর দেখেই তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে চিঠিটি মাথায় ঠেকিয়ে প্রায় অস্ফুট কণ্ঠে বললেন 'আমার গুরুদেবের চিঠি! কী ব্যাপার, এতকাল পরে, হঠাৎ!'

পরম গুরু যে একজন আছেন, তা-ই কেউ ভাবে নি। তিনি যে এখনও জীবিত থাকতে পারেন, সে তো অবিশ্বাস্য তথ্য। তবু সকলেই সসম্ভ্রমে মাথায় হাত ঠেকালেন একবার।

চিঠি খুলে পড়বার পর মহেশানন্দ যেন কতকটা ধপ্ করে বসে পড়লেন তাঁর অজিনাবৃত ডানলোপিলোর আসনে। মুখের বিহ্বলতা ক্রমশ পাংশু বর্ণ ধারণ করল। যেন একটু ভয়ই পেয়ে গেছেন তিনি। অথচ তার কারণটাও ঠিক জানা নেই—তাই কিছু বিহ্বলতাও।

ক্রমশ অন্তরঙ্গ শিষ্যরা অনেক সংবাদই অপরদের জানালেন।

পরম গুরুদেব থাকেন হিমালয়ের এক দুর্গম স্থানে। দীর্ঘকাল তাঁর সঙ্গে কোনো যোগাযোগ নেই। এই শিষ্যটির গতিবিধি, তাঁর সাধনা, এই আশ্রমের কার্যকলাপ—এসবের যে তিনি খবর রাখবেন তার কোনো জ্ঞাত উপায় নেই। সেখানে ডাক যায় না। এখান থেকে লোক যাতায়াতও প্রায় অসম্ভব।

তবে কি পরম গুরুদেবের অলৌকিক আশ্চর্য যোগবলেই এ সংবাদ, এই সিদ্ধিলাভের বার্তা তাঁর কাছে পৌঁচেছে? তাই আশীর্বাদ করে বা অভিনন্দন জানিয়ে চিঠি পাঠিয়েছেন? তিনিই বা এঁকে পাঠালেন কি ভাবে, কেমন করেই বা এলেন ইনি?

প্রাথমিক বিস্ময়ের জড়তা কাটতে, একটু, স্থির হতেই ব্যাকুলভাবে খোঁজ করলেন মহেশানন্দ, সে সাধু গেলেন কোথায়? নিশ্চয়ই আমার গুরু-ভাই। দুরারোহ দুর্গম পাহাড় থেকে এসেছেন, ওঁর বিশ্রামের প্রয়োজন। ছাখো ছাখো কোথায় গেলেন।'

কোথাও আর তাঁকে দেখা গেল না। কেউ কেউ বললেন, সে সাধু ওঁর হাতে চিঠি দিয়েই দ্রুত নেমে এসে আশ্রম থেকে বেরিয়ে গেছেন। কোথায় কোন্ দিকে গেছেন তা কেউ অত লক্ষ্য করে নি। একজন শুধু বললে, যমুনার দিকে যেতে দেখেছে। তখনই বহু লোক ছুটলো যমুনা-পুলিন থেকে পানিঘাট পর্যন্ত, কিন্তু ও বর্ণনায় কোনো কারুর খোঁজ কেউ দিতে পারল না।

মন খারাপের এই তো যথেষ্ট কারণ। তবু গুরুর চিঠির কাছে এ কিছুই নয়। সে মর্মান্তিক, দুঃসহ!

চিঠি নয়। আদেশ।

তিনি সংস্কৃত ভাষাতে যা লিখেছেন তা সরল বাংলায় অনুবাদ করলে এই দাঁড়ায়।

"শুনলাম তোমার শিষ্যশিষ্যারা তোমার সিদ্ধিলাভ উপলক্ষে উৎসব অনুষ্ঠান করছেন। এমনভাবে মিথ্যার প্রাসাদ গড়ে তুলো না। আত্মপ্রতারণা করো না। সিদ্ধিলাভে তোমার অধিকার নেই আমি জানি। এক ঘৃণ্যতম পাপ তার অন্তরায়। সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত তুষানলে দেহত্যাগ।

সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত না হলে ব্রহ্মপ্রাপ্তি সম্ভব নয়। তুমি শিষ্যদের প্রতারিত করেছ, সেই সঙ্গে নিজেকেও। গুরু হিসেবে আমার কর্তব্য তোমার সাধনার দায়িত্ব নেওয়া। সে কর্তব্য পালনের অবকাশ না দিয়েই তুমি প্রতিষ্ঠার লোভে জনসমাজে চলে গিয়েছিলে। তবু আমি আমার কর্তব্য হিসাবে তোমাকে সতর্ক করে দিলাম। আর আমার কোনো দায়িত্ব রইল না, তোমার সঙ্গে কোনো সম্পর্কও না।"

বহুক্ষণ স্তম্ভিত হয়ে বসে রইলেন মহেশানন্দ।

দৃষ্টিতে আকুলতা ও বিহ্বলতার এক অবর্ণনীয় সংমিশ্রণ।

কিছুই বুঝতে পারছেন না তিনি, এ নিদারুণ আদেশের কারণ।...

অনেকক্ষণ পরে শিষ্যদের সেখান থেকে চলে যাবার ইঙ্গিত করে প্রায় স্খলিত পদে নিজের সাধন কুটির অর্থাৎ শয়নগৃহের সংলগ্ন গবাক্ষহীন ছোট্ট ঘরে প্রবেশ করে অবসন্নভাবে ব্যাঘ্রচর্মের আসনটিতে বসে পড়-লেন।

এ কি হলো! এখন কি করবেন তিনি।

সুদীর্ঘকাল পরে, 'জীবনের চরম সার্থকতার মুহূর্তে এ কি দুঃসহ আঘাত হানলেন! কোনো যোগাযোগ ছিল না, তবে গুরু জীবিত আছেন এখনও এটা জানতেন। শেষ যখন দেখা হয় তখন তিনি বলেছিলেন, এ দেহটা ছাড়লে খবর পাবি, সে ব্যবস্থা আমি করে যাবো।

জীবিত আছেন বলেই অযাচিত এ সম্পর্ক স্থাপনের, এ শাসনের অর্থ কি?

সত্যিই কি এমন ঘৃণ্য পাপ করেছেন কিছু? কোনো অমার্জনীয় অপরাধ? করলেও নিশ্চয়ই করেছেন, গুরুদেব নইলে লিখবেন কেন! কী সে পাপ? কিছুই তো তেমন মনে পড়ছে না।

আর তাঁর যে ধারণা, তাঁর সিদ্ধিলাভ হয়েছে, ব্রহ্মের সঙ্গে একাত্ম হতে পেরেছেন, তিনি অন্তত ক্ষণিকের জন্য, সেও মিথ্যা? সত্যিই নিজেকে প্রতারিত করেছেন?

অস্থির হয়ে উঠে দাঁড়ালেন একবার, ক্লান্ত ভাবে প্রায় তখনই বসে পড়-লেন। আজ এত কাল পরে মনে হচ্ছে শরীর তাঁর বশীভূত নয়। অথবা

বশীভূত বলেই মানসিক অবসাদের সঙ্গেই এমনভাবেঅবসন্ন হয়ে পড়ছে। এ যেন কী এক কঠিন বন্ধনে কে নিষ্পেষিত করছে তাঁকে অদৃশ্য নাগ-পাশে। কোনোমতেই মুক্তি নেই ওঁর।

গুরু যা লিখেছেন তা মিথ্যা হতে পারে না, এটুকু উনি জানেন। বাক্-সিদ্ধ অন্তর্যামী মহাপুরুষ।

তবু নিজের পাপের কথাও তো কিছু মনে পড়ছে না, যার জন্যে তুষা-নলে প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়।···

অপরাহ্ণ কেটে গেল, সন্ধ্যা নামল। ক্রমে রাত্রিও গভীর হয়ে এলো! উদ্বিগ্ন অস্থির শিষ্যের দল এক্ষেত্রে তাঁদের কি করণীয় বুঝতে না পেরে বারবার দ্বারপ্রান্ত পর্যন্ত এসে ফিরে যাচ্ছেন, ওঁকে ডাকতে বা ঘরে ঢুকতে সাহস হচ্ছে না।

এই বিপুল কর্মযজ্ঞ আরম্ভের আর মাত্র দুটি দিন বাকী, এ সময় এ কি বিপদ!

বহুরাত্রি পর্যন্ত সেই একভাবে বসে থাকার পর সহসাই যেন অন্ধকারে পথ দেখতে পেলেন মহেশানন্দ।

এত অস্থির হবার কি আছে, গরুর শরণ নিলেই তো হয়।

সঙ্গে সঙ্গে তিনি সেইখানেই ইষ্ট ও গুরুর ছবির সামনে লুটিয়ে পড়ে প্রার্থনা জানালেন, 'প্রভু, তুমিই বলে দাও, আমি এমন কি পাপ করেছি!'

আর সঙ্গে সঙ্গেই যেন বিদ্যুৎ চমকের মতো মনে পড়ে গেল কথাটা।

পাপ, হ্যাঁ পাপই। ঘৃণ্য পাপ, তাতেও কোনো সন্দেহ নেই।

আশ্চর্য, স্মৃতিটা কেমন করে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছল মন থেকে।

বহুদিন, বহু বৎসর আগের কথা। অন্তত ত্রিশ বছর। তখন তাঁর বছর পঞ্চাশ বয়স হবে। কিন্তু সত্যকার সাধকের মতোই জীবন যাপন করার জন্যেই সে দেহে তখনও যৌবনের শক্তি। মনে অপরিসীম উৎসাহ, তেজ, আর যা—তাকে জেদ বলাই উচিত! অকারণ, অপরিমাণ আত্ম-বিশ্বাস, তিনি যা বোঝেন তাই ঠিক, তাঁর কোনো ভুল হতে পারে না এমনি একটা ধারণা।

তখন সবে এখানের এই আশ্রম তৈরী হয়েছে। দোতলায় মাত্র তিনখানি ঘর। দালানেও পাকা ছাদ হয় নি। মন্দিরও এত বড়, এত বিস্তৃত করা যায় নি।

অবশ্য তখনই বেশ কিছু লোক তাঁর কাছে দীক্ষা নিয়েছে, তাদের অর্থেই মন্দির আশ্রম গড়ে উঠছে। তার মধ্যে একটি মহিলা তাঁর বিশেষ স্নেহের পাত্রী ছিলেন। ঠিক স্নেহেও নয়, এই শিষ্যাকে যেন সম্ভ্রমের চোখেই দেখতেন তিনি।

কলকাতার এক বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ পরিবারের মেয়ে, জমিদার ঘরের বৌ। বয়স তখন তাঁর বোধহয় মহেশানন্দর মতোই হবে, কি কয়েক বছরের ছোট। শান্ত, ভদ্র, কলেজে না পড়লেও বেশ শিক্ষিতা, ব্রত পূজা দান ধ্যানে অগ্রণী উপবাস-উপলক্ষের অন্ত ছিল না। স্বামী তখনও জীবিত, তৎসত্ত্বেও কতকটা তপস্বিনীর জীবনযাপন করতেন। নাম ছিল রাণী, মহেশানন্দ সস্নেহে বলতেন, 'তোমার রাণী নাম অসম্পূর্ণ মা, তুমি মহারাণী।'

যারা সৎ, যারা ঈশ্বর বিশ্বাসী ভগবান তাদেরই বেশী আঘাত দেন, বোধকরি সামান্য অবশিষ্ট মালিন্য পুড়িয়ে নিখাদ সোনা করে দেন ভক্তদের।

রাণীর একটি মাত্র মেয়ে উমা অকস্মাৎ বিধবা হলো।

তারও খুব বড় ঘরে বিয়ে হয়েছিল, জমিদারের ঘরে, শুধু বিত্তই নয় শ্বশুর পরিবার শিক্ষা ও সংস্কৃতির জন্যও বিখ্যাত। বরও সব দিক দিয়েই যোগ্য। ইঞ্জিনীয়ার, পড়তে পড়তেই বিয়ে হয়েছিল তবু শিবপুর থেকে প্রথম স্থান পেয়ে পাস করেছিল। সে জন্যে মোটা মাইনেব চাকরি পেতেও দেরি হয় নি।

সেই জামাই, রত্ন বলতে গেলে, মাত্র দু দিনের অসুখে মারা গেল। অসুখ কি তা ডাক্তাররা বোঝবার আগেই চোখ বুজলো সে। তখন উমার বয়স মাত্র ছাব্বিশ, একটি সন্তান হয়েছে সবে, কিন্তু শিশু।

রাণী সদ্য-বিধবা মেয়েকে এনে গুরুদেবের পায়ের কাছে আছড়ে পড়লেন।

'একি হলো বাবা আমার। এ আমার কি সর্বনাশ হলো। এ দেখার আগে আমি মলুম না কেন?'

উচ্চাঙ্গের হাসি হেসে বলেছিলেন মহেশানন্দ—মহারাণী এও তাঁরই লীলা। বাছাই করা মানুষকেই তিনি টেনে নেন, আর ইহলোকের বন্ধন না কাটলে টেনে নেবার যে ভারি অসুবিধা। যাকে তাকে তিনি এ-দুঃখ দেন না, যোগ্য আধার দেখেই দেন. যাতে তারা বাইরের জগতে আঘাত পেয়ে তাঁর কাছেই ছুটে আসে আশ্রয় নিতে।'

রাণী বললেন, 'বাবা মেয়েটা কি নিয়ে থাকবে, কি করে একটু শান্তি পাবে। আমি যে আর ভাবতে পারছি না।'

'তোমাকে ভাবতে হবে কেন মা, তার জন্যে তো আমি আছি! সে ব্যবস্থা আমিই করব।'

ওঁর ঐ দৃঢ় আত্মপ্রত্যয় পূর্ণ আশা ও আশ্বাসের বাণীতে উমা মুখ তুলে তাকাল।

সত্যিই নির্মল শিশিরে ধোওয়া শিউলি ফুলের মতো কোমল নিষ্পাপ মুখ মেয়েটার। সুন্দর হয়ত নয় খুব কিন্তু তবু ফুল ছাড়া কিছুর সঙ্গেই তুলনা দেওয়া যায় না।

দু তিন দিন বাদে উমাকে ডেকে একদিন বললেন, 'সাধনার পথে না গেলে শান্তি পাওয়া যাবে না ভাই, ভগবানের কাছেই মানুষের পরম আশ্রয়। তবে সে পথে যাওয়ারও টিকিট চাই। আমি তোকে সামনের পূর্ণিমায় দীক্ষা দেব।'

উমা ব্যস্ত হয়ে উঠল, 'কিন্তু আমার যে দীক্ষা হয়ে গেছে!'

'হয়ে গেছে! সে কি! কে দিলে?'

'আমার শ্বশুর বাড়ির কুলগুরু। বাড়িতে নারায়ণ আছেন, লক্ষ্মী-জনার্দন, দীক্ষা না নিয়ে তাঁর সেবার কাজ করতে পারব না বলে শাশুড়ীই দিইয়ে দিয়েছেন।'

'কি ইষ্ট ওঁদের?'

'এঁরা বৈষ্ণব।'

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, 'দীক্ষা কি বস্তু, কোন্‌দিকে তোমার

মনের গতি বুঝতে না দিয়ে, এই বোঝা ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া তাঁদের উচিত হয় নি। আর এই ভাবে যে ইষ্টমন্ত্র দেওয়া হয়েছে তা আজীবন বহন করার কোনো দায়িত্ব আছে বলে আমি মনে করিও না। ও বীজ তুমি বিল্বপত্রে লিখে যমুনার জলে ভাসিয়ে দিয়ে এসো, আমি তোমাকে শৈবমন্ত্রে দীক্ষা দেব।'

'কিন্তু সে কি উচিত হবে!' ভয়ে ভয়ে প্রশ্ন করেছিল উমা।

'আমি যখন বলেছি, ভেবেই বলেছি। সে ভালোমন্দর বিচারটা আমার ওপরই ছেড়ে দে না। তুই উত্তম আধার যাকে-তাকে শৈব দীক্ষা দেওয়া যায় না। ভগবান যেন তোকে এইজন্যেই তৈরী করেছেন। আর ছাখ না, তা নইলে তোর উমা নামই বা হবে কেন!'

তবু উমা অনেক ইতস্তত করেছিল। ইতস্তত করেছিলেন রাণীও। কিন্তু মহেশানন্দর প্রবল ব্যক্তিত্বে শেষ পর্যন্ত কতকটা বিমূঢ় ভাবেই, যন্ত্র-চালিতের মতো উমা তার ইষ্টমন্ত্র ভাসিয়ে দিয়ে এসে ওঁর কাছে শৈবমন্ত্রে দীক্ষা নিল।

কাজটা হয়ে গেল বটে, তবু ওর মন যে সুস্থির হলো না, শান্তিতো পেলই না এবং অশান্তি আরও বাড়ল। ছটফট করে বেড়াতে লাগল—তা তীক্ষ্ণদৃষ্টি বুদ্ধিমান মহেশানন্দর বুঝতে বাকী রইল না। রাণীও শুষ্ক মুখে এসে জানালেন, 'কী হবে বাবা, এ বোধহয় হিতে বিপরীত হলো। মেয়েটা একেবারে খাওয়া-দাওয়া ছেড়ে দিয়েছে, ফুলকোমুখী হয়ে যেন পাগলের মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে। কারও সঙ্গে কথা কইছে না—পাগল হয়ে যাবে না তো? কেবলই বলছে ইষ্ট বিসর্জন দিলুম, স্বামীর ইষ্ট—এ বোধহয় ভালো হলো না।'

মহেশানন্দ বললেন, 'দাঁড়া, যেমন রোগ তার তেমনি ওষুধও আছে আমার কাছে। এমন বোঝা ওর ঘাড়ে চাপাবো যে এসব বাজে চিন্তার সময়ই পাবে না। আজই সন্ধ্যা-আরতির পর আমার কাছে পাঠাবি, আমি ওকে যৌগিক প্রক্রিয়া কতকগুলো দেব, সামনে থেকে করাবো।'

প্রথম প্রথম তাতে কিছু কাজ হয়েছিল। শুধু যোগাসন নয়, কিছু কিছু সাধন-প্রক্রিয়াতেও ওকে শিক্ষা দিচ্ছিলেন মহেশানন্দ। কোনো সাধককে

এতকাল এত অন্তরঙ্গ ভাবে দেখে নি উমা, এসব যে আছে তাও জানত না। এ মহেশানন্দ যেন আলাদা এক মানুষ। কঠিন, যেন নির্মম ভাবে কঠোর; কণ্ঠস্বর মেঘমন্দ্র; সব মিলিয়ে এ এমন এক ব্যক্তিত্ব যার আদেশ লঙ্ঘন করা যায় না।

আসলে সম্মোহনের পদ্ধতিও জানতেন মহেশানন্দ, তাঁর কাছে এটা যে কোনো জাদুকরের থেকে সহজসাধ্য। সে শক্তি কিছু ব্যবহার করেছিলেন কিনা আজ আর তা মনে নেই। তবে সত্যকার যোগসাধনার শিক্ষা দিলে শিক্ষার্থীরা এমনিতেই খানিকটা সম্মোহিত হয়ে পড়ে। উমাও ওঁর সামনে এসে কেমন যেন অসহায় হয়ে পড়ত, আত্মসমর্পিতের মতো নির্বিকারে ওঁর আদেশ পালন করত।

মহেশানন্দর মনে আগে থেকে কোনো অসৎ অভিসন্ধি ছিল না—এটা গুরুর চোখের ওপর চোখ রেখে বলতে পারতেন তিনি। ফুলের মতো কোমল, নিষ্পাপ, ভক্তিমতী একটি মেয়ে, তার যে এমন অমোঘ আকর্ষণ থাকতে পারে তা ব্রহ্মচারী মহেশানন্দ জানতেনও না। তাঁর আত্ম-অহমিকাও ছিল খুব। তাঁর কোনো দিন পদস্খলন হবে, হতে পারে—এ ছিল তাঁর সুদূর কল্পনারও অতীত।

তবু সেই অঘটনই ঘটল।

শিক্ষাদানের একটি অসতর্ক মুহূর্তে—উমা একেবারে তাঁর বুকের কাছে এসে পড়েছিল। তার উষ্ণ নিশ্বাস এসে লাগছিল ওঁর মুখে। দুটি অর্ধ-নিমীলিত সম্মোহিত চোখ ওঁর চোখের ওপর আবদ্ধ, আত্মসমর্পণ নয়, নিঃশর্ত আদেশ পালনের ছবি তাতে।···

সেই মুহূর্তটিতেই মহেশানন্দর এতদিনের অস্খলিত ব্রহ্মচর্য নষ্ট হয়ে গেল। এমন বহু বড় বড় ঋষি তপস্বীরই হয়েছে—পুরাণের এসব কাহিনী ক্ষণেকের মোহে পথভ্রষ্ট তপস্বীদের আশ্বাস দেবার জন্যই রচিত। কিন্তু মেয়েটা এসব ভাবলও না, পরের দিনই ওপরের ছাদ থেকে পাথর বাঁধানো উঠোনে লাফিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করল।

ইষ্ট ত্যাগের অনুশোচনাতেই পাগল হয়ে একাজ করেছে উমা, এই কথাই সকলে জানল, এমন কি তার মাও। আর অবিরত সে কথা শুনতে

শুনতে কবে উনিও নিজের অপরাধের কথা ভুলে বসেছিলেন।
ভোলেন নি ওঁর গুরুদেব।

পরের দিন ভোরে উঠে কেউ আর মহেশানন্দকে খুঁজে পেল না। দরজা খোলা, ঘরের, আশ্রমের—সুতরাং অন্তর্হিত হয়েছেন, একথা বলা গেল না।

অতবড় উৎসবের আয়োজন সমস্তই বৃথা হয়ে গেল।

সাধু দর্শন

প্রথম আমি হরিদ্বার যাই ১৯১৮ সালে, তখন আমার মাত্র ন'বছর বয়স। হরিদ্বার তখন সত্যই স্বর্গদ্বার ছিল। সেই কুলুকুলু-প্লাবিনী উপলাহত গঙ্গা, সেই দু'দিকে মেঘনীল পর্বতশ্রেণী, এপারে গঙ্গাতীরে ঘন আম-বাগান—সব মিলিয়ে কল্পনার স্বর্গই যেন দেখতে পেয়েছিলাম। সে স্বর্গ মানুষের অর্থ লোভ আর ঐশ্বর্যের দম্ভের মধ্যে কোথায় হারিয়ে গেছে, আর তাকে কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না।

তখন এত বড় বড় অট্টালিকা ছিল না, কে কত বড় করতে পারে যেন তারই পাল্লা দিয়ে—ভোলাগিরি মহারাজের আশ্রমের মধ্যে শুধু মন্দির-টাই পাকা ছিল তখন, গুরুমহারাজ নিজে থাকতেন খড়ের চালের ঘরেই। উন্মুক্ত আকাশের নিচে নুড়ি বিছানো নদীতীরে একটি ডেক-চেয়ারে বসে থাকতেন তিনি। ঐ গঙ্গার ওপরই রাত্রে একটি ক্যাম্প-খাটে তাঁর বিছানা হতো—তার দুটো পায়া অন্তত জলের মধ্যেই থাকত। আমরা তাঁকে দর্শন করতে গিয়ে সেই পাথরের ওপরই বসেছি।

আমরা সে যাত্রায় গিয়েছিলাম পাঁচ মাস. ফাল্গুন থেকে আষাঢ় পর্যন্ত। এর মধ্যে বৈশাখ মাসে গিয়েছিলাম হৃষীকেশে। তখন হৃষীকেশ অবধি ট্রেন ছিল না, দইওলা স্টেশন (না রাইওলা?) থেকে হেঁটে যেতে হতো। আমরাও তাই গিয়েছিলাম, হৃষীকেশ তখন আরও শান্তির নীড় ছিল। এত বাস এবং তৎসংশ্লিষ্ট অনাচারের আড্ডা ছিল না। ধর্মশালাও অল্প কটি, তার মধ্যে কালীকমলীবাবার ধর্মশালা ও অন্নসত্রই প্রধান। এই সত্র থেকে বহু সাধুকে 'ভিক্ষা' দেওয়া হতো, মাথা পিছু বিরাট বড় এক হাতা ভাত, ছ'খানা থালার মতো রুটি, দু'হাতা ডাল, কোনো দিন একটু আধটু 'শাক' বা তরকারি। বহু দূর দূরান্তর থেকে সাধুরা আস-তেন ভিক্ষা নিতে; অনেকে নিজে আসতেন না, একজন সাধুই ছ সাত জনের ভিক্ষা নিয়ে যেতেন। এসে দাঁড়ালেই পাত্রের আকার দেখে একজনের বেশী বুঝে প্রশ্ন হতো—'ক মুরত?' মানে ক'জনের ভিক্ষা?

সেই হিসেবে—এঁরা যেমন বলতেন—কেউ বা বলতেন ছ মূরত, কেউ বা সাত, সেই হিসেবে ঐ মাথা পিছু ছখানা রুটি ও বড় বাটির মতো হাণ্ডার এক হাতা করে ভাত দেওয়া হতো।

বহু দূর দূর থেকে আসতেন বলেই কখনও কখনও খুব বিপর্যয়ও ঘটত। লছমনঝোলার দিক থেকে যাঁরা আসতেন তাঁদের দু-একটা ছোট পাহাড়ী নদী পেরিয়ে আসতে হতো, তার মধ্যে চন্দ্রভাগা ছিল প্রধান (পাঞ্জাবের চেনাব নয়)। এখন এর উপর দিয়ে গাড়ি যাবার পুল হয়েছে, তখন ছিল না। গাড়িই নেই তার পুলের দরকার কি? আর নদীতে জলই থাকত না, শুধু বড় বড় নুড়ির River bed দেখে দেখা যেত যেন একটা পাহাড়ী নদীর খাত। কদাচ কখনও, কোনো কোনো জায়গায় জল দেখা যেত, সেও পায়ের চেটোডোবা জল, তাই ও নদী নিয়ে কেউ ততো মাথা ঘামাত না।

কিন্তু এই সব শুষ্ক শীর্ণ পাহাড়ী নদীই এক এক সময় পলকে প্রলয় ঘটাত। যখন ওপর থেকে জল নামত, তেমন বিপুল এক পশলা বৃষ্টি হলে—এখনকার ভাষায় যাকে cloud burst বলে—মুহূর্ত মধ্যে বিপুল জলরাশি এই খাত প্লাবিত করতো। আমরা যেদিন হৃষীকেশ যাই তার দু তিন দিন আগেই চন্দ্রভাগায় এমনি এক দুর্ঘটনা ঘটে গেছে। রৌদ্র-করোজ্জ্বল নির্মেঘ আকাশ, নদীগর্ভও শুষ্ক—সাধুরা পরমানন্দে কালী-কমলীর ওখানে যাচ্ছিলেন। ঠিক মাঝামাঝি আসতেই জল চলে এলো, সত্যিসত্যিই যেন চোখের পলকে। সাধারণ মানুষের গলা অবধি জল কিন্তু এমন তার স্রোত—কারও সাধ্য নেই তা থেকে আত্মরক্ষা করে কি সাঁতার কাটে। গঙ্গা যে এইখানেই ঐরাবতকে ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন তাতে বিস্মিত হবার বা অবিশ্বাস করার কিছু নেই।

আমরা হৃষীকেশে দিন তিনেক ছিলাম। বড় নিরিবিলি, বড় সুন্দর জায়গা ছিল, সাধনারই উপযুক্ত। ত্রিবেণী ঘাটও তখন ছিল জনবিরল। দু চার জন তপস্বীর ঝোপড়া ছিল পাকা, ঘর যা দু চারটে শহরের মধ্যে, গঙ্গা তীরে তেমন দেখেছি বলে মনে পড়ে না। আমরা অবশ্য সত্রে খেতে পেতুম না, বাইরে হোটেল ছিল। উৎকৃষ্ট বাসমতী চালের ভাত, ডাল

ও একটা আলুর ভর্তা বা চটকানো আলুসেদ্ধর ঝোল-ঝাল তরকারি, অথবা একটু আচার। মাটির মেঝেতে মাটির থান দেওয়া চৌকায় বসে খেতে হতো—গঙ্গাজলে রান্না, গঙ্গা জল পান—খরচ ছিল পেটভরা খাওয়া দশ পয়সা। অবশ্য তখনকার দশ পয়সা। হৃষীকেশেই একদিন একটা হোটেলে ছ পয়সাতেও 'ঢাবা' খেয়েছি।

হৃষীকেশ থেকে আমরা একদিন ভোরে লছমনঝুলা রওনা দিলাম। হাঁটা পথ তো বটেই—তবে মাইল তিনেক রাস্তা, এমন কিছু নয়।

বৈশাখের শেষ কিন্তু তখনও প্রচণ্ড শীত। হরিদ্বার শহরেই আমরা বৈশাখেও লেপ বা 'রেজাই' গায়ে দিয়েছি। তখন এত সিমেণ্টের বাড়ি আর অ্যাশফাল্‌ট্‌ অথবা খোয়া সিমেণ্টের রাস্তা ছিল না, তখন বছরে আট মাস রাত আটটা থেকে সকাল আটটা পর্যন্ত ওখানে একটা শন্‌শনে হাওয়া উঠত। হাড় কাঁপিয়ে দিত। হায়, সে এখন স্বপ্নের কথা হয়ে গেছে।

কোট গায়ে গলায় গরম চাদর জড়িয়ে যাচ্ছি আমরা কাঁপতে কাঁপতে ; কাঁপা ছাড়া গতি কি—চা খাওয়ারও অভ্যেস ছিল না, পথে চা পাওয়ারও কোনো সম্ভাবনা নেই—গা গরম করবো তার উপায় কি? জোরে হেঁটে যেটুকু হয়।

পথ ঠিক জনহীন না হলেও জনবিরল। তখনও গরমের ভিড় শুরু হয় নি। যা দু চারজন আসছে যাচ্ছে—নীরবে, তাতে পথের শান্তি বিঘ্নিত হয় না।

সাধুও যাচ্ছেন কদাচিত এক আধজন। কৌপীনবস্ত্র ভস্মাচ্ছাদিত সাধুই বেশী—তাঁদের নমস্কার জানালে কেউ অভয় মুদ্রা, কেউ বা আশীর্বাদের মুদ্রা করে 'নারায়ণ' 'নারায়ণ' অথবা 'শিব শিব' উচ্চারণ করে প্রত্যভিবাদন জানাচ্ছেন।

এইভাবে খানিকটা হাঁটবার পর এক বিচিত্র দৃশ্য চোখে পড়ল। গুহা ঠিক নয়, পথের ধারে একটা খাঁজ-মতো, পাহাড়েরই একটা অংশ (মানে আল্‌গা পাথর নয়) বেরিয়ে এসে সেখানে একটু আচ্ছাদনের সৃষ্টি করেছে ; তারই নিচে বসে আছেন এক অপেক্ষাকৃত তরুণ বয়স্ক সাধু—বছর

চল্লিশের বেশি হবে না বয়স, সামনে একটা মোটা কাঠের গুঁড়ি জ্বলছে ধুনি হিসেবে, খুব রৈ রৈ করে জ্বলছে যে তা নয়—ধোঁয়াচ্ছে এই মাত্র। পিছনে ঠিক তেমনিই একটা মোটা গুঁড়ি—সামান্য একটুখানি হরিণের চামড়ায় বসে পিছনের গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে সামনের গুঁড়িতে পা তুলে দিয়েছেন—ঠিক আরাম করে ইজী চেয়ারে বসার মতো। এক চিলতে কৌপীন ছাড়া কিছু নেই পরনে, সর্বাঙ্গ ছাই মাখা, মাথায় জটা—মুখে চোখে যেন আনন্দ উপ্‌চে পড়ছে। সেটা ঘর বা গুহা যা-ই বলুন, জায়গাটায় একটা নারকেল মালার কমণ্ডলু ও মাটিতে পোঁতা একটা চিমটে ছাড়া কিছুই নেই।

আমার তখন ঐ তো বয়স, তবু সাধুর মুখের আনন্দ ও একটা যেন তৃপ্তির ভাব আমাকে একটু অবাক করে দিয়েছিল—চমকে থেমে গিয়েছিলাম আপনিই। পরে দেখলাম আমার দুই দাদা মা—তাঁরাও দাঁড়িয়ে গেছেন। মা (এখানে এসে এটা শিখেছিলেন, খুব চালাচ্ছিলেন এই পথে বেরিয়ে) দুহাত জোড় করে 'নারায়ণ' বলে নমস্কার জানাতে সাধু যেন অকস্মাৎ উপচে পড়া আনন্দর একটা অনাবিল হাসিতে ভেঙে লুটিয়ে পড়লেন একেবারে 'নারায়ণ মাঈ নারায়ণ, নারায়ণ'।

সেই বয়সেই প্রথম আমার মনে জেগে ছিল, কিছুই তো নেই, কোনো পার্থিব ভোগ্য বস্তুই, আমরা কোট পরে শীতে কাঁপছি—উনি খালি গায়ে কাঠে হেলান দিয়ে বসে এতো আনন্দের উপকরণ কোথা থেকে পাচ্ছেন—সংগ্রহ করছেন! কী আছে এ জীবনে—যাতে বিলাস তো তুচ্ছ, জীবনযাত্রার দৈনন্দিন প্রয়োজনকেও এতো অবহেলা করতে পারেন অনায়াসে !!

এঁকে কিছু পয়সা দেওয়া উচিত কিনা বুঝতে না পেরে মা'র কিছুই দেওয়া হলো না। তিনি বার বার আপসোস করে বলতে লাগলেন, 'পয়সা দিলে কিছু যে কিনে খাবেন তা তো মনে হয় না, এখানে বাজার দোকানই বা কৈ—সঙ্গে একটু মিষ্টি কি ফল থাকলে দিয়ে যেতুম। তোকে বললুম এত করে যে কিছু সঙ্গে নে, তোরাও তো খেতে পারতিস!'

শেষের কথাগুলো আমার বড় দাদাকে উদ্দেশ্য করে বলা—বলা বাহুল্য।

উনি কি খান, ভিক্ষা নিতে যান কিনা—এ আলোচনাও হলো বৈকি। কিন্তু কাকে জিজ্ঞাসা করবেন? পাণ্ডা একজন লোক দিয়েছিলেন সঙ্গে—সে উদাস ভাবে বললে 'কৈ দেতা জরুর, মহাৎমা লোক ইধার বিনা ভোজনমে রহতা থোড়ই! আউর কোই ভিক্ষা লে আকর পৌঁছ দেতা সায়দ!'

এ উত্তরটা আমরা পেয়েছিলাম স্বর্গাশ্রম থেকে ফেরার পথে।

তখন সন্ধ্যা হয় হয়, ঝিকিমিকি বেলা যাকে বলে। এখানে পাহাড়ের গায়ে সারাদিন বিস্তর গরু চরে, এরা খায় ভগবানের বাগানে, দুধ দেয় মানুষের ঘরে এসে। গোয়ালাদের খরচা কম। সেইজন্যে শীতকালে হিমালয়ের উঁচু জায়গাগুলো থেকে বিস্তর গয়লা 'মাইগ্রেট' করে দেরাদুন হরিদ্বার এই সব বা এই ধরনের নিচু পাহাড়ী অঞ্চলে।

কৌতূহল তো ছিলই, আসবার সময় তাই খুঁজে খুঁজে লক্ষ্য করতে করতে এসেছিলাম সেই গুহাটা।

কাছে আসতে দেখি ইতিমধ্যে একটি ছোটখাটো গরু সেখানে এসে পৌঁছেছে। একটা বাছুর তার দুটো বাঁট থেকে দুধ খাচ্ছে, সাধু খাচ্ছেন আর দুটো বাঁট থেকে। গরুটা নির্বিকার প্রশান্ত মুখে দাঁড়িয়ে একবার বাছুরের পিঠটা চাটছে, আর একবার ঐ সন্ন্যাসীর জটা। এ দৃশ্য জীবনে কখনও ভুলব না। এই তো, একষট্টি বাষট্টি বছরেও ভুলি নি।

এই যাত্রায় স্বর্গাশ্রমে—তখনকার স্বর্গাশ্রম, এখনকার গীতাভবন হোটেল রেস্তোরাঁ মুখরিত বেড়াবার কি পিকনিকের জায়গা নয়—আর এক আশ্চর্য সাধুকে দেখেছিলাম। ইচ্ছা রইল আসছে বারে সে গল্প আপনাদের বলব। অবশ্যই বানানো গল্প নয়—সত্যকার অভিজ্ঞতাই। সেও অবিস্মরণীয়, এখনকার মানুষের কাছে অবিশ্বাস্য।

ভিক্ষান্ন

অনেক দিন আগের কথা। আমরা হরিদ্বারে গিয়ে সূরযমল ধর্মশালায় উঠেছি। আমি আর আমার দুই বন্ধু। পুঁজি-পাটা কম, কোনোমতে ট্রেন ভাড়াটা মাত্র যোগাড় করে যাওয়া—তাও তখন থার্ডক্লাস (এখনকার ক্লাস টু) পূজা কনসেশন রিটার্ন টিকিট ছিল মাত্র ষোল টাকা, কলকাতা থেকে ৯২৭ মাইল, যাওয়া-আসা—৪৫ দিনের মধ্যে ফিরলেই হলো—এখনকার তুলনায় রাম-রাজত্বের ব্যাপার। কিন্তু তখন ষোল টাকা যোগাড় করতেই হিমসিম খেতে হতো।

গাড়ি ভাড়া ছাড়া বন্ধুরা প্রত্যেকে মাত্র দশটি করে টাকা নিয়ে গেছি। সুতরাং হোটেলে ওঠার প্রশ্ন নেই। তাছাড়া হোটেল তখন অত ছিলও না—সে, যতদূর মনে হচ্ছে ১৯৩৫ সালের কথা, কিংবা '৩৬। অবশ্য ভালো ভালো ধর্মশালাও ছিল। কিন্তু সূরযমল ধর্মশালা বাজারের মধ্যে, 'হর কি প্যারী' থেকে কাছে। তাছাড়া জীবনে প্রথম গিয়ে (১৯১৮ সাল) ঐ ধর্মশালাতেই উঠেছিলুম। দু'দিন পরেই অবশ্য মারোয়াড়ী পঞ্চায়েতিতে চলে যাই। বাগানওয়ালা সুন্দর ধর্মশালা, ঘর বলতে এক একটা এপার্টমেণ্ট এখনকার ভাষায়—ভালো লেগেছিল। তবু, প্রথম ওঠার জন্যেই বোধহয় একটা নস্ট্যালজিয়া ছিল। নইলে অত প্রাচীন দেওয়ালগুলোর বিবিধ প্রাকৃতিক কার্যের দাগে ভরা ঘরে উঠব কেন?

সে যাক, যা বলছিলুম।

আমার যাওয়ার দিন-দুই পরেই একদিন হুড়মুড় করে এক বিরাট দল এসে পড়লেন। মহিলাই বেশী, বৃদ্ধা ও বিধবা, দু'চারজন পুরুষও ছিলেন। শুনলাম উত্তর ভারতের এক বৃদ্ধা গায়িকা—এককালে খুব নাম ছিল। এখনও বুড়ো হলেও মোটা টাকার মুজরো করেন। তিনি প্রায় জনা পঞ্চাশেক বৃদ্ধাদের নিয়ে এই তীর্থ করতে বেরিয়েছেন। খরচ সব তাঁর

—পুণ্যকর্ম হিসাবেই এটা করছেন।

তিনি ছিলেন তিন দিন। তার মধ্যেই একদিন সাধুদের ভাণ্ডারা দিলেন। আর একদিন কাঙালীভোজন করালেন (এখন নাম হয়েছে নারায়ণ সেবা)। শেষেরটা হলো 'হর কি প্যারীতে'—ভাণ্ডারাটা হলো-ঐ ধর্মশালাতেই। বলা বাহুল্য আমরাও উক্ত ভাণ্ডারার শেষে কিছু লাড্ডু আর পেঁড়া পেয়েছিলাম।

সাধু-ভোজন শেষ হলে মহিলা প্রত্যেককে পাঁচটি করে টাকা দক্ষিণা ও একটি করে কম্বল দান করলেন।

সকলেই 'জয়ধ্বনি' করে আশীর্বাদ করতে করতে বিদায় নিলেন।

ভাণ্ডারার ঝামেলা চুকে গেলে আমরাও ঘরে তালা লাগিয়ে বেরিয়ে পড়লুম। আমাদের সঙ্গে এক 'চাতাল' বন্ধু ছিলেন, চায়ের দোকানের অভাবে তাঁর বড় কষ্ট হচ্ছিল। স্পিরিট ল্যাম্পে দু'বার চা খাওয়ানো হচ্ছিল, কিন্তু তাতে তাঁর মন উঠবে কেন? সেদিন একটা কথা কানে এসেছিল যে 'টি-সেস কমিটি' থেকে ঠেলা-গাড়ি করে চায়ের বিজ্ঞাপন হিসেবে বিনামূল্যে চা খাওয়ানো হচ্ছে, কাল 'হর কি প্যারীতে' হয়ে গেছে, (আমরা পাহাড়ের দিকে বেড়াতে গেছলাম)—আজ কন্‌খল বাজারের মোড়ে দেওয়া হবে।

সুতরাং চলো কনখল।

হাঁটতে হাঁটতে চলেছি। খালের পুল পেরিয়ে নির্জন পথে পড়তে (খুবই নির্জন ছিল ও জায়গাটা —এখন দেখলে সেদিনের অবস্থা কল্পনা করতে পারবেন না!) হঠাৎ নজরে পড়ল এক কোণে একটি জটাধারী সাধু যেন খুব কুণ্ঠিত ভাবে দাঁড়িয়ে আছেন।

নির্জন বলেই নজরে পড়ল। ভাবলাম ভিক্ষা চাইবার জন্যেই ঐ ভাবে অপেক্ষা করছেন। কিন্তু প্রায়-জনহীন পথে কে ওকে ভিক্ষা দেবে!

লোকটির নির্বুদ্ধিতা নিয়ে হাসাহাসি করছি, আর একটু কাছে আসতে —তখন পথের মধ্যে মধ্যে কেরোসিনের আলো ভরসা ছিল, বিদ্যুৎ আসে নি—নজরে পড়ল সাধুজীর বগলে একটি নতুন পশমী কম্বল।

কম্বলের চেহারা দেখেই বুঝলুম—এ কিছু পূর্বেই উনি ভাণ্ডারাতে পেয়ে-

ছেন, দক্ষিণার সঙ্গে।

মনটা বিরূপ হয়ে উঠল।

এত খেয়ে, নগদ পাঁচটা টাকা পেয়ে আবারও ভিক্ষার জন্য দাঁড়িয়ে আছে লোকটা! এই সাধু! ছোঃ!

অতঃপর 'পেটটালা ভ্রষ্ট সাধুর' নিন্দায় মুখর হয়ে উঠব, এ স্বাভাবিক। কিন্তু আমার আর এক বন্ধুর আর সহ্য হলো না—তিনি সাধুর সামনে এগিয়ে গিয়ে ক্রুদ্ধ স্বরে বললেন, 'দ্বিপহর মে ইংনা খায়া, রুপৈয়া ভি মিলা পাঁচকো—তব ভি ভিখ্ মাগতে হো। কম সে কম আজ কে লিয়ে ইয়ে ছোড় দেনা থা, ইংনা লালচ পয়সা কা!'

সাধুটি রাগ করলেন না—বরং যেন তাঁর কুণ্ঠার সীমা রইল না। বললেন, 'নেহি জি, হাম ইয়ে কম্বল আউর উহ্ রুপৈয়া কিসিকো দেনে মাঙ্গতে হ্যায়, লেকিন সাধুকে পাস সে কৈ লেতা নেহি। আব্ হাম কেয়া করে।'

'দেনে মাঙ্গতে হো! ইসকে মতলব?' ভাবলুম লোকটা খুব ধড়িবাজ—আমাদের ওপর চাল দিচ্ছে, 'তো হিঁয়া কাহে? হিঁয়া হ্যায় কৌন?'

'নেহি নেহি, হাম ওহি—হরদোয়ার কো সব্জি মণ্ডিসে দেখ কর আতে হেঁ—রাজ ঘাটমে হামারা ঝোপড়ী, ওঁহি ওয়াপস যানা হ্যায়—লেকিন কোই নেহি লিয়া। গঙ্গাজীমে ফেকনে কে ভি দিল নেহি চাহতা। ইংনা আচ্ছা কম্বল, সামনে জাড়াকে দিন আতা হ্যায়। পহলে উহ্ হাস-পাতালমে চলা যাতে তো আচ্ছা হোতা। আব তো উহ্ ভি বন্ধ হো গিয়া সায়েদ।'

আরও অবাক হই।

বলি, 'তা তুমি বিলিয়ে দিতেই বা চাইছ কেন? রাখতে দোষ কি?'

সাধুটি যেন আরও সঙ্কুচিত হয়ে হাত-জোড় করে বললেন, 'বাবুজী, আমরা সন্ন্যাস নিয়েছি ভিক্ষা করে খাবার কথা। পরের দিনের জন্যে সঞ্চয় করে রাখব তো সংসার ছাড়লাম কেন? প্রতিদিন যা প্রয়োজন ভিক্ষা করব—এই আমার গুরুর আদেশ, যদি কোনো দিন না পাই, উপবাস করব। তাতে কোনো ক্ষতি নেই—একদিন উপবাসে কেউ মরে যায় না। কিন্তু সঞ্চয় করা বড় দোষ। আমাদের পথ থেকে ভ্রষ্ট হওয়া।'

আমি বললুম, 'তা কম্বলটা রাখছ না কেন ? তোমার গায়ে তো ওটা তুলোর কম্বল, তাও পুরনো। এটা তো কাজে লাগত।'
'বাবুজী, ওতেই তো আমার কাজ চলে যাচ্ছে। আবার যখন দরকার হবে, পরমাৎমাই দিলাইয়ে দিবেন।'
'তা এটা রেখে ওটা দাওনা কেন ? নতুনটাই তো রাখা ভালো।'
'না না, পরকে পুরনো জিনিস দিয়ে ভালোটা রাখব—নতুনটা—এও লালচের কথা।'
তারপর বললো, 'আপনারা রাখবেন বাবুজী, এই কম্বলটা আর টাকা কটা ? চৌক বাজারে যদি যান অনেক অভাবী লোক পাবেন, আপনাদের কাছ থেকে নেবে তারা।'
আমাদের মুখে আর কথা যোগায় না, নীরবে হাত পেতে নিলাম—সেই কম্বল আর পাঁচটা টাকা।

যে পাশেই আছে

অনেকদিন পরে দেখা হয়ে গেল ভদ্রলোকের সঙ্গে। নামটা মনে পড়ে নি প্রথমে, তাও পড়ল। অরূপবাবু নাম, অরূপ ঘোষ। পুরো পাঁচটি বছর আমাদের পাশের বাড়িতে কাটিয়ে গেছেন। ও বাড়িটা শুধু নয়, কাছাকাছি তিন চারটে বাড়িতেই যাদবপুর কলেজের ছাত্রদের মেস ছিল—ইঞ্জিনীয়ারিংয়ের ছাত্র সবাই। উত্তরবঙ্গ, পূর্ববঙ্গ এমন কি বিহার উড়িষ্যা থেকেও অনেকে পড়তে আসত—তারা থাকবে কোথায়? হোস্টেলে অত ছাত্রের স্থান হতো না।

অরূপবাবু যে মেসে থাকতেন, সেটা আমাদের বাড়ির লাগোয়া—একতলা হলেও বড় বাড়ি। ভেতরদিকে বাগানের মধ্যেও কয়েকটা ঘর করে দিয়েছিলেন বাড়িও'লা। আমাদের ঘর থেকে, ছাদের ওপর থেকে, বাগান থেকে—এমন কি উঁচু বাথরুমের সিঁড়ি থেকেও মেসের অনেক ঘর দেখা যেত। অনেকের সঙ্গে তাই আলাপও হয়েছে—কেউ পুরো কোর্স শেষ করে পরীক্ষা দিয়ে চলে গেছে, কেউ বা মধ্য পথেই ইস্তফা দিয়েছে। আমার একটু কৌতূহল বেশী তা অকপটেই স্বীকার করছি। অবসর পেলেই এদিক ওদিক থেকে বিভিন্ন ঘরের অধিবাসীদের লক্ষ্য করেছি। তাতে বিচিত্র অভিজ্ঞতা লাভ হয়েছে। দেখেছি দুই বন্ধুর প্রণয় দৃশ্য। আবার দেখেছি এক বন্ধুর অনুপস্থিতিতে ঘরের আর এক বন্ধু পূর্বোক্তের মাখন চুরি করে খাচ্ছে।

এই সূত্রেই অরূপের সঙ্গে আলাপ। তিনি আমাদের বাড়িতেও আসতেন—মার সঙ্গে বসে গল্প করতেন। সে গল্পর আমিও কিছু শুনেছি। তারপর দীর্ঘকাল আর কোনো যোগাযোগ না থাকাতে ভুলেই গিছলুম প্রায়। আজ আবার নতুন করে মনে পড়ল। তার সঙ্গে নতুন করে যোগ হলো তাঁর বহু বিচিত্র অভিজ্ঞতা, তাঁর তীব্র আকুতি ও তার বিচিত্রতর

পরিণতির কাহিনী।

ট্রেনেই দেখা, একই ট্রেনে কাশী যাচ্ছিলুম। একটি ফাস্টক্লাস 'কুপেতে' তিনি আর আমি। কুপ বলেই—দরজা বন্ধ রাখা সম্ভব হয়েছিল, সকাল-বেলাও এগারটা পর্যন্ত কেউ সে কামরা আক্রমণ করে নি। গল্প করার বা শোনার পূর্ণ অবসর মিলেছিল।

গল্প করা বলাও হয়ত ভুল। প্রশ্নোত্তর বললেই ঠিক হয় আরও—সে কথাবার্তাকে।

প্রশ্ন করার একটা সূত্রও ছিল বৈকি।

কারণ ওঁর জীবনের প্রথম অংশটা আমার জানা ছিল অনেকখানি।

বাল্যকাল থেকেই একটা অদ্ভুত পাগলামি ছিল অরূপবাবুর—সেই যখন পাঁচ বছর বয়েস তিনি শ্রীকৃষ্ণকে দেখবেন। ওঁদের বৈষ্ণবের বংশ, ঠাকুমা রাধাকৃষ্ণের পট পুজো করতেন। ঠাকুমার কাছেই প্রথম বায়না ধরেন তিনি—'কেষ্টকে দেখাও!'

প্রথম ছেলে ভুলনোর চেষ্টা, তারপর যুক্তি-তর্ক—শেষে ধমকানি, তবু কিছুতেই ঐ ছেলেকে নিবৃত্ত করা যায় না। মাঝে মাঝেই বিশেষ কাউকে পুজো করতে দেখলেই ঐ বায়না! আমি শ্রীকৃষ্ণকে দেখব। কৃষ্ণ অবশ্য তখন বলতে পারতেন না সব সময়ে, তবে বলবার চেষ্টা করতেন।

দশ বারো বছর বয়সের সময় এটাই তীব্র হয়ে উঠল, এই আকাঙ্ক্ষা বা ঝোঁক। ওঁর মায়ের ভাষায় 'ছেমো চাপা'। ওঁদের দেশ কলকাতার বাইরে হলেও খুব দূরে নয়। হুগলী জেলার এক বর্ধিষ্ণু গণ্ডগ্রাম, সেখানে মন্দির মসজিদ অনেক। ওঁদের বাড়ির কাছেই এক রাধাকৃষ্ণ-কাম-শিবের মন্দির ছিল। বারো বছরের ছেলে অরূপ একদিন মন্দিরের পূজারীকে চেপে ধরলেন; 'আমাকে শ্রীকৃষ্ণ দেখাও, শিব দেখাও।'

বৃদ্ধ পূজারীও প্রথমটা সান্ত্বনা ও কিছু উপদেশ দিয়ে শান্ত করার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু অরূপকে নাছোড়বান্দা দেখে ওঁর বাপকে ডেকে পাঠালেন। বললেন, 'এ এক মহাপুরুষ এসেছে বাপ তোমার ঘরে, এই বয়সে—শুনেছি আরও আগে পাঁচ ছ বছর থেকেই এই আকুতি এই আকুলতা ঈশ্বর দর্শনের জন্যে, এ তো মহাপ্রভু ছাড়া কারও দেখা গেছে বলে

শুনি নি। এ তো তাজ্জব করলে বাবা তোমার ছেলে! তুমি একে ঘর-বাসী করতে পারবে বলে তো মনে হয় না। তা সে চেষ্টা ছাড়তে বলছি না, তবে তুমি এক কাজ করো, ওকে দীক্ষা দেওয়াবার ব্যবস্থা করো। তাতে ওর মন শান্ত হবে, আত্মস্থ হবে—চাই কি অভিলাষও পূর্ণ হতে পারে ইষ্ট মন্ত্র জপ করতে করতে। জপাৎ সিদ্ধির্জপাৎ সিদ্ধির্জপাৎ সিদ্ধির্নসংশয়ঃ।

ভাগ্যক্রমে সেই সময়ই-- এক সন্ন্যাসী এসে পড়লেন ওদের গ্রামে। এমন আগে মাঝে মাঝেই আসতেন—গঙ্গাসাগর যাবার বা সেখান থেকে ফেরার সময় জটাজূটধারী বিশালকায় সন্ন্যাসী, দেখলে ভক্তি হয়। তিনি ওখান-কার রীতি-মতো মন্দিরেই আশ্রয় নিয়েছিলেন। তিনি অরূপকে দেখে ও ওর অদ্ভুত খেয়ালের কথা শুনে বললেন, 'আমি ওকে দীক্ষা দেবো। ওকে তোমরা আমার হাতে ছেড়ে দাও।'

এতে ওর বাপ-মারও বিশেষ আপত্তি হলো না। বরং তাঁরা এ যোগা-যোগটা ঈশ্বরেরই স্পষ্ট নির্দেশ বলে মনে করলেন। ছেলে মহাপ্রভুর মতো সন্ন্যাসের পথে চলেছে মনে করে মার একটু মন খারাপ হলেও, একটু গর্বও যে বোধ করলেন না তা নয়। পাড়া-ঘরে বলে বেড়াতে লাগলেন, 'এত ছেলে থাকতে ভগবান আমার ছেলেটিকেই বা তাঁর কাছে বেছে নিলেন কেন কে জানে!'

দীক্ষা হলো। অরূপ মন দিয়ে নিষ্ঠার সঙ্গে মন্ত্র জপ করতে লাগলেন। সেই সঙ্গে ধ্যান চিন্তা···যেমন সাধু বলে দিয়েছেন সবই চলতে লাগল। নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য পালনেও ত্রুটি হলো না, হবিষ্যান্ন গ্রহণ, কম্বলে শোওয়া, রাত্রির শেষ প্রহর থাকতেই শয্যা ত্যাগ···গুরু যা যা বলে দিয়েছেন। কিন্তু দিন পনেরো ষোল পরেই অরূপ অধৈর্য হয়ে পড়লেন। গুরুর কাছে গিয়ে বললেন 'কৈ, দেখতে তো পাচ্ছি না ভগবানকে! কেমন মন্ত্র দিলেন।'

সাধুজী তো বিরক্ত হবেনই। বললেন, 'এরই মধ্যে! একি ছেলেখেলা! কত বড় বড় ঋষিমুনি—এঁরা জীবনপাত করলেন তবু ভগবানের দেখা-পেলেন না—তুমি পনেরো দিনেই কেল্লা মেরে দেবে। ভাগ। মন দিয়ে

এইভাবে তাঁকে ডাকো, এক মনে তপস্যা করো—যদি দয়া হয় তিনি দেখা দেবেনই তবে সে দু'চার দিনে দু'চার বছরে হবে না। তিনিও ভক্তকে বাজিয়ে দেখে নেবেন বৈকি, তার বাঞ্ছা সাচ্চা না ঝুটা।'

অত ধৈর্য অরূপের রইল না। সাধুও কিছুদিন পরে নিজের জায়গায় চলে গেলেন। ঠিকানা একটা দিয়ে গিছলেন—কিন্তু সেখানে কখনও উনি যান নি, চিঠি লেখার প্রয়োজনও বোধ করেন নি।

তবে, সৌভাগ্যক্রমে লেখাপড়াটা ছাড়েন নি অরূপবাবু। ম্যাট্রিক পাস করেছেন, আই. এস-সি, এসব ভালোভাবেই পাস করেছেন। বাবার ইচ্ছামতো ইঞ্জিনীয়ারিং পড়তে এসেছিলেন। শিবপুরে ভর্তি হ'তে পারেন নি, যাদবপুরে কিন্তু অনায়াসেই ভর্তি হয়েছিলেন। তখন অত ধরপাকড় তদ্বির তদারক লাগত না।

ইঞ্জিনীয়ারিং পাস করেছিলেন বেশ সগৌরবে। ওঁর বিশেষ শাখায় উনি প্রথম হয়েছিলেন তাই চাকরি পাওয়ারও কোনো অসুবিধা হয় নি। তবে ইচ্ছা করেই উনি সরকারী চাকরি নিয়েছিলেন—ফাঁকি দেবার ফাঁক বেশী বলে। বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে কাজ করলে হয়ত টাকা বেশী পাওয়া যায়—খাটতেও হয় অনেক বেশী। নিজের নিভৃত চিন্তা বা উদ্দেশ্য সাধনের অবসর পাওয়া যায় না।

উনি ভারত সরকারের ইরিগেশান বিভাগে কাজ নিয়েছেন, এখন রিটায়ার করলেও বিশেষজ্ঞ হিসেবে ওঁকে রেখে দিয়েছে, প্রয়োজন মতো এরাজ্যে ওরাজ্যে যেতে হয়। তাতে আয়ও কিছুমাত্র কমে নি। বেশ ভালোই আছেন।

লেখাপড়া চাকরি সব করলেও আসল যে নেশা—ভগবানকে প্রত্যক্ষ দেখার—সেটা কাটে নি। সেইজন্যই বাবা-মা জ্যেঠার অনেক চেষ্টা সত্ত্বেও বিয়ে করতে রাজী হন নি। বরং চাকরি করতে করতে, কাজের ফাঁকে দেশ-বিদেশে ঘুরেছেন অনেক—সাধু ধরবার জন্যে। শুনেছেন, বই-তেও পড়েছেন, বিশেষ রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দর জীবন বৃত্তান্ত থেকে যে—একমাত্র যথার্থ সাধু, সিদ্ধসাধক যাঁরা তাঁরাই ঈশ্বরকে দেখতে পান ও দেখাতে পারেন। একথা এমনকি একদিন এক মুসলমান ভদ্রলোকের

মুখেও শুনেছেন, তিনি বলেছিলেন, রামকৃষ্ণ, তৈলঙ্গস্বামী, মৌলালী ফকির এঁদের কথা। বলেছিলেন, এঁরা ইচ্ছা করলে পৃথিবীর গতি বন্ধ রাখতে পারেন।

তা দেখেছেন অনেক সাধু। রামেশ্বর, কন্যাকুমারী থেকে কাশ্মীরের ক্ষীর-ভবানী, কেদার গঙ্গোত্রী—ওদিকে পুরী কামাখ্যা থেকে দ্বারকা পর্যন্ত, যেখানে যেখানে সাধুর আড্ডা সব জায়গাতেই গেছেন—অনেকেরই পায়ে পড়েছেন—কিন্তু পান নি কিছুই, মনও ভরে নি।

এই পর্যন্ত বলে মৌন হলেন অরূপবাবু। যেন একটু রহস্যময় হাসি ওঁর বন্ধ ঠোঁটের দুই কোণে। আরও যেন আরও কিছু রহস্য বাকী রইল —বোধহয় তার মধ্যে কৌতুকের কথাও কিছু আছে।

আমি সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করলুম, 'তারপর?'

উনি বললেন, 'তার পরও শুনতে চান?'

'হ্যাঁ'।

'ইতিহাস একটু বাকী আছে এটা ঠিক। তবে সে আমার ব্যর্থতার ইতিহাস কি সার্থকতার তা জানি না। হয়ত কি ভাববেন, মনে মনে হাসবেন, আমাকে হামবাগ হিপোক্রিট ভাববেন —সেই ভয়েই ঠিক বলতে চাইছি না।'

'না না, বলুন, বলুন। প্লীজ। আপনাকে তো আজ থেকে দেখছি না। ওসব ভাববই বা কেন? আপনার সিনসিয়ারিটির অভাব তখনও দেখি নি, আজও দেখছি না।'

তবু একটু চুপ করে থেকে বললেন, 'এই ভাবেই ঘুরছি, হঠাৎ রামকৃষ্ণ মিশনের এক প্রবীণ সাধুর মুখে খবর পেলুম, উত্তর কাশীতে কে একজন খুব বৃদ্ধ সাধু আছেন রাঘবানন্দ অবধূত, তাঁর একশো বছরের ওপর বয়স হয়েছে তিনি যথার্থ ব্রহ্মজ্ঞ, ঈশ্বরজানিত মহাপুরুষ। তিনি মঠ করেন নি, মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন নি, চেলা করেন নি। আশ্রম প্রতিষ্ঠা কি শিষ্যও করেন নি। সাধারণ একটি মাটির ঘরে বাস করেন। দৈনিক দশঘণ্টা বরফ গলা-গঙ্গার জলে দাঁড়িয়ে তপস্যা করেন। কোথাও ভিক্ষায় যান না, কোনো ভক্ত অনুগ্রহ কবে ঘরে খাবার পৌঁছে দিয়ে

গেলে খান। নয়ত চুপ করে বসে থাকেন একটা খালি চৌকীতে। শুতেও কেউ কখনও দেখে নি।

'গেলাম তখনই ছুটে উত্তর কাশী। সরকারী বড় চাকরি করি আশ্রয়ের অভাব নেই। খুঁজে বারও করলাম রাঘবানন্দ মহারাজকে। বিশাল দেহ, আয়ত চক্ষু—কিন্তু দৃষ্টি একেবারে নিস্পৃহ, উদাসীন। সবাই ভয় দেখিয়েছিল—উনি তো কথাই বলেন না, ওঁর কাছে কি প্রার্থনা জানাবে তুমি। ওঁর বসে থাকার ভঙ্গী আর মুখের ভাব দেখেও বেশ একটু দমে গেলুম। তবু, এসেছি এত দূর, অন্তত প্রার্থনা বা ইচ্ছা জানাতে ছাড়ব কেন? পায়ে মাথা রেখে প্রণাম করে আস্তে আস্তে একটু ভয়ে ভয়েই আমার আকুতি বা অভিলাষ জানালুম। কিন্তু কী আশ্চর্য গণেশবাবু, আপনাকে কি বলব, এখনও মনে হলে গায়ে কাঁটা দেয়—তিনি আমার দিকে ফিরে চোখে চোখ রেখে পরিষ্কার করে বললেন, কণ্ঠে কোনো জড়তা নেই, তিরস্কার নেই, ব্যঙ্গ বিদ্রূপও নেই। বললেন, 'বেটা কস্তুরীমৃগর নাম শুনেছ? তাদের নাভি পাকলে তারা সেই তীব্র গন্ধ কোথা থেকে আসছে তাই খোঁজাব জন্যে পাগলের মতো বন থেকে বনান্তরে ছুটে বেড়ায়। তোমারও সেই হাল হয়েছে। কাকে খুঁজছ, ভগবানকে? ভগবানকে প্রত্যক্ষ দেখবে? একটা আয়না নিয়ে মুখ দেখ না কেন? ভগবান কোথায় নেই বলো তো? তুমি তো লেখাপড়া করেছ—এটা জানো না? আমাতে আছেন, তোমাতে আছেন, গাছে-পালায়, পাহাড়ে নদীতে সর্বত্রই তো তাঁর প্রকাশ, প্রত্যক্ষ উপস্থিতি। আমরা যে তপস্যা করছি সেই ব্রহ্মের সমগ্র রূপকে মনের মধ্যে ধ্যান করে আনন্দ পাবো বলে। অন্য কোনো আশায় নয়। তাকে দূরে কোথায় খুঁজছ, তিনি সর্বদা যে তোমার সঙ্গে রয়েছেন। সেইটে বিশ্বাস করো, উপলব্ধি করো—তাঁর এই যে বিকাশ তোমার দেহের মধ্যে, তোমার এই জন্মের খণ্ডরূপে তাঁকে সার্থক করো—ব্যাস, তোমার ছুটি।'

'তারপর বললেন, 'আমার একটা পরামর্শ শুনবে বেটা? তুমি ঘরে ফিরে যাও সাদী করো গে। তোমার মধ্যে কামনা আছে বিস্তর, কামও। সে কিছু খারাপও নয়—যদি তাকে সৎ পথে চালিত করতে পারো। এই

জীবন এই সংসার সুন্দর ভাবে চালনা করাই তাঁকে প্রসন্ন করার এক-মাত্র পথ। তোমার মধ্যের কামই ঈশ্বরানুরক্তির ছদ্মবেশ নিয়েছে। যথার্থ সে ভাব থাকলে এমন ভাবে ছুটে বেড়াতে না। মনের সেই অতৃপ্ত উত্তেজনাই এই একটা উপলক্ষ ক'রে ছুটিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে। যাও, ফিরে গিয়ে বিবাহ করো, সৎ সংসারীর জীবন কাটাও। তিনি কাছেই আছেন, তিনি সব দেখছেন, তোমার মধ্যে থেকে সংসারের লীলাও অনুভব করছেন, শুধু এইটে মনে রেখো—আর অশান্তি, এই অনর্থক ব্যাকুলতা থাকবে না।'

'তারপর ?' আবারও প্রশ্ন করি।

'তারপর আর কি। তাঁর আদেশই পালন করেছি। বিবাহ করেছি। ছেলেমেয়ে হয়েছে, তারাও নিজের নিজের জীবন বেছে নিয়েছে। আমি এখন সেই পাশের মানুষ কাছের মানুষটির সঙ্গে ভাব জমাবার জন্যে মাঝে মাঝে এমনি একলা বেরিয়ে পড়ি, কোনো জনারণ্যের মধ্যে থেকেও যদি একবার নিভৃত অবসর পাই এই আশায়।'

'সে কাছের মানুষকে কি পেয়েছেন ?'

'জানি না। তবে ভাই শান্তি পেয়েছি।' বলতে বলতেই দেখলাম তাঁর দুই চোখের কোল বেয়ে জল ঝড়ে পড়ল—নিঃশব্দে। তবে সে দুঃখের অশ্রু বলে বোধ হলো না। হয়ত আনন্দেরই অশ্রু, প্রশান্তির প্রকাশ। তিনি চশমা খুলে চোখ মুছতে মুছতে একটু হাসবার চেষ্টা করলেন।

সাধকের বহু জন্ম

এ গল্প আমার খানিকটা শোনা স্বয়ং কালিকানন্দর মুখ থেকে, কিছুটা পরে অন্য দু'চারজন তাঁর জীবন-নাট্যের পাত্র-পাত্রী যারা, তাদের কাছ থেকে—আর কিছুটা, প্রয়োজন মতো, ফাঁক ভরিয়ে নেওয়া আমার কল্পনা দিয়ে। কৌতূহল অদম্য হওয়াতেই খুঁজে খুঁজে তাঁর সংসারাশ্রমের সেই সব মানুষগুলিকে খুঁজে বার করেছি—তবে সকলের দেখা পাই নি, সব কথা জানাও যায় নি। সেইজন্যেই অনুমানের আশ্রয় নিতে হয়েছে। সুতরাং একে সত্য ঘটনা বলা চলবে না কিছুতেই। সত্য ঘটনা অনেক সময়ই কল্পিত গল্পের চেয়ে অনেক রোমাঞ্চকর অনেক অবিশ্বাস্য বোধ হয়। ভগবানের কল্পনার কাছে মানুষের কল্পনা পৌঁছবেই বা কি করে। মানুষই তো ভগবানের কল্পনার সৃষ্টি।

কালিকানন্দর সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় হয় বহুদিন আগে। সে বোধ-হয় ১৯২৩ সাল। সে সময়ে যাঁরা বৃন্দাবন গিয়েছিলেন—মানে রেলের পাস খরচ করতে কয়েক ঘণ্টার জন্যে যাওয়া নয়, যথার্থ যাত্রী যাঁরা—তাঁরা নিশ্চয় দেখেছেন। কারণ বৃন্দাবনে সে সময়ে নূতন শক্তি মন্দির হয়েছে, সোনার দশভুজা মূর্তি—অবশ্য-দ্রষ্টব্যের মধ্যেই। আর সে মন্দিরে যাঁরা সন্ধ্যার ঝোঁকে গেছেন তাঁরাই দেখেছেন প্রশস্ত সিঁড়ির মাঝের একটা ধাপে একপাশে বসে আছেন এক শান্ত সৌম্য মুণ্ডিত মস্তক সন্ন্যাসী, স্থির—কতকটা আত্মসমাহিত ভাবে। কালিকানন্দ ছিলেন, দণ্ডী, নাকি সেই জন্যেই তিনি মন্দিরের মধ্যে ঢুকতেন না—কখনও কোনো গৃহস্থের ঘরেও যেতেন না।

অধিকাংশ দর্শনার্থীই দেখতেন তাঁকে, লক্ষ্য করতেন না অত। কেন মন্দিরে ঢোকেন না, পূজায় অংশ নেন না—তাও কেউ জানতে চাইত না। কিন্তু কে জানে কেন আমার সেই বালক বয়সেই তাঁকে বড় ভালো লেগেছিল, আমি কাছে গিয়ে বসে তাঁর সঙ্গে গল্প করতুম, কেন তিনি এইভাবে একপাশে বসে থাকেন জানতে চাইতুম।

বড় মিষ্টস্বভাবের মিষ্টভাষী লোক ছিলেন মানুষটি। আস্তে আস্তে কথা কইতেন, ছেলেমানুষের কৌতূহলে বিরক্ত বোধ করতেন না। এই মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা সন্ন্যাসী তাঁর গুরু—তবে দণ্ডী থেকে গেছেন উনি নিজের ইচ্ছাতেই। এখান থেকে দূরে কোথাও গিয়ে তপস্যা করবেন এই ইচ্ছা ছিল তাঁর, কিন্তু গুরুর আদেশ অন্যরূপ, তাই যাওয়া হয় নি। তিনিই বলেছেন থাকতে এখানে।

সে যাত্রা আমরা প্রায় চার পাঁচ মাস ছিলাম বৃন্দাবনে। নিত্যই দেখা হতো বলতে গেলে। মন্দিরটি ভালো, পূজা আরতি খুব নিষ্ঠার সঙ্গেই হতো। তারপর প্রায়, একঘণ্টা ধরে চলত ভজনকীর্তন—সেই লোভেই আমরা বেশী যেতুম ওখানে।

কিন্তু আমরা থাকতে থাকতেই এক অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটল। যার ফলে কালিকানন্দ আর বৃন্দাবনে থাকতে রাজী হলেন না। এক ভদ্রলোক সস্ত্রীক আমাদের মতোই ওঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন, শেষ পর্যন্ত ওঁর কাছে দীক্ষা নিতে চাইলেন। কালিকানন্দ বললেন, 'গুরুর প্রতিষ্ঠিত আশ্রম এটা, ওঁর অনুমতি না পেলে তো আমি দীক্ষা দিতে পারব না। আগে ওঁর অনুমতি নিন।'

সেই অনুমতি নিতে গিয়েই ঐ বিশ্রী ব্যাপারটা ঘটল। গুরু চটে গেলেন, এটা তাঁর প্রতি উপেক্ষা অপমান বলে মনে করলেন—দীক্ষাপ্রার্থীদের কটু কথা বললেন, কালিকানন্দকে আদেশ দিলেন ঋষিকেশে তাঁর যে আশ্রম আছে সেখানে গিয়ে থাকতে।

এরপর আর কোনো খবর পাই নি তাঁর। বছর দুই পরে বৃন্দাবনে গিয়ে শুনলাম ১৯২৪ এর প্রলয়ঙ্কর বন্যায় ঋষিকেশ কনখলের বহু আশ্রম ধুয়ে মুছে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে, সাধু মারা গেছেন অগণিত—সেই সঙ্গে এঁদের আশ্রম ও কালিকানন্দও নিশ্চিহ্ন হয়েছেন।

অমন ভালো লোকটির এই শোচনীয় মৃত্যু ঘটল!

মনটা খুবই খারাপ হয়ে গেল। আরও এমন বহু সাধুই গেছেন উত্তরকাশী প্রভৃতি অঞ্চলেও। তার মধ্যে যথার্থ সাধুও নিশ্চয় অনেকে ছিলেন। তাঁদের ওপর ঈশ্বরের এ কোপ পড়ল কেন—কে জানে।

কিন্তু এর বহু বছর পরে—১৯৫১-৫২ নাগাদ—একদা আবিষ্কার করলুম —কালিকানন্দ সে বন্যায় মারা যান নি, তখনও পর্যন্ত বহাল তবিয়তে বেঁচে আছেন।

আবিষ্কার করলুম মানে চোখেই দেখলুম।

চেনা অবশ্যই কঠিন, কারণ ১৯২৩এ তাঁকে দেখেছি বছর পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ বয়সের লোক, তার সঙ্গে আঠাশ বছর যোগ করলে দাঁড়ায় তেষট্টি-চৌষট্টি। প্রৌঢ়ও না, বৃদ্ধই হয়েছেন। তবুও যে চিনতে পারলুম তার কারণ চেহারাটায় কিছু কিছু বদল হলেও মুখের আকৃতি দেহের গঠন চলন-বলন অনেকটা একই থেকে গেছে।

দেখা পেলুম উত্তর-কাশীর উজলীতে। কালভৈরব মন্দিরের একটি ছোট্ট কুটিয়ায় এক সাধু থাকেন, বাঙালী শরীর, সত্রে ভিক্ষা করে খান। বিখ্যাত সাধু ব্রহ্মদত্তর অনুকরণে বা অনুসরণে—অনেকক্ষণ ধরে গঙ্গা-জলে আকণ্ঠ ডুবে থেকে ধ্যান করেন। অনেকে বলাবলি করায় কৌতূহল হয়েছিল, মধ্যাহ্নে যখন জল থেকে উঠে আসেন সেই সময় গিয়ে একদিন ধরলুম তাঁকে। তাও একেবারে প্রথম দেখাতেই চিনতে পারি নি—'কোথায় যেন দেখেছি এঁকে, কার সঙ্গে যেন আদল' ভাবতে ভাবতেই মনে পড়ে গেল। ততক্ষণে উনি আমার প্রণামের উত্তরে অস্ফুট-কণ্ঠে 'শিব' 'শিব' উচ্চারণ করে অনেকদূরে এগিয়ে গিয়েছেন। একরকম ছুটে গিয়েই ধরলুম তাঁকে, পরিষ্কার বাংলায় জিজ্ঞাসা করলুম, 'মাপ করবেন, আপনি কি সেই বৃন্দাবনের স্বামী কালিকানন্দ মহারাজ?'

এবার তিনিও থমকে দাঁড়ালেন। ভুরু কুঁচকে তাকালেন আমার মুখের দিকে, তারপর অত্যন্ত শান্তকণ্ঠে বললেন, 'হ্যাঁ বাবা, তাই ছিলাম এক-কালে, এখন আমি চিৎস্বরূপানন্দ নামে পরিচিত। কিন্তু আপনাকে তো—'

'সে অনেক দিনের কথা হয়ে গেল, আপনার মনে থাকার কথা নয়। উনিশশো তেইশ সালের কথা—আমরা ছিলাম গোপীনাথ-ঘেরায়, মা, দাদা আর আমি—'

"সহসা বিস্মৃতি ছুটে সাধু ফুকারিয়া উঠে ঠিক বটে ঠিক—" কবির ঐ

পংক্তির মতোই কালিকানন্দজী বলে উঠলেন, 'হ্যাঁ বাবা, মনে পড়েছে। আপনার মা আমাকে খুব স্নেহ করতেন, আপনিও কে জানে কেন আমার কাছেই এসে বসতেন। অনেকদিন ছিলেন আপনারা। তা এখানে কোথায়—?'

'আমাকে আর আপনি বলে লজ্জা দিচ্ছেন কেন! আমি এখানে ঐ রামকৃষ্ণ মিশনের সাধুদের যে কুটিয়া আছে তারই কাছে এক ধর্মশালায় উঠেছি।'

'এই বয়সে এখানে? ভালো লাগছে তোমার? না সাধু দেখার বাতিক আছে?'

'তা আছে। সেই বাতিকেই তো আপনাকে খুঁজে পেলাম। আপনার কুটিয়াও দেখে এসেছি, তবে আপনিই যে কালিকানন্দজী তা জানতুম না। কাছেই রামানন্দ থাকেন, তাঁকে দেখতে গিয়েই—। চলুন না আপনার সঙ্গে যেতে যেতেই কথা বলি। বাতাস লেগে কাঁপছেন, এতক্ষণ জলে ছিলেন—ঘরেই চলুন।'

গেলাম তাঁর সঙ্গে। তাঁর হয়ত অত ইচ্ছা ছিল না—কিন্তু ঠিক বাধা দিতেও পারলেন না। গবাক্ষহীন ছোট্ট একটি ঘর, মাটির গাঁথুনি, মাথায় স্লেট পাথরের মতো পাতলা পাথরের চালা ছাদ। ঘরে একটি কম্বল পাতা, একটি চৌকীতে কিছু পুঁথি আছে, একটি হরিণের ছালের আসন, একটি নারকেলমালার কমণ্ডলু, একটি ছোট্ট পেতলের বালতি – তার মধ্যে ভাত ডাল তরকারি সব একত্র করা, তারই পাশে মেঝেতে খান দুই তিন রুটি, বোধহয় কেউ ভিক্ষা সংগ্রহ করে এনে রেখে গেছে, প্রত্যহই হয়ত এমনি-যায়। দোরে কোনো তালা নেই, আমরাও শেকল খুলে ঢুকলুম। চুরি যাবার মতো কোনো জিনিসই নেই তালা কি হবে। দ্বিতীয় কোনো বহির্বাসও নজরে পড়ল না, একটা বালিশ পর্যন্ত না। শুধু ঐ চৌকীর ওপরই একটি সাধুর ছবি আছে বাঁধানো—সম্ভবত নূতন কোনো গুরুর, বৃন্দাবনের সে জটাধারী সাধু নন।

আমার দৃষ্টি ওদিকে স্থির হয়ে আছে দেখে বললেন, 'হ্যাঁ বাবা। এটা আমার জন্মান্তর প্রকৃতপক্ষে, এখন নূতন গুরু নিতে কোনো বাধা ছিল

না। ওঁর কৃপা পেয়েই আমি ধন্য হয়েছি, শান্তি পেয়েছি—হয়ত একদিন পরমপ্রাপ্তিও ঘটবে। না ঘটলেও কোনো দুঃখ হবে না, সে ব্যাকুলতা কি উৎকণ্ঠাও নেই—সাধনা করতে পারছি, তাঁকে ভাববার চেষ্টা করছি, সেই আমার সুখ, মহা আনন্দ।'

তখন ওঁর আহারের সময় বলে আর বসলুম না। সন্ধ্যা হয় হয়, সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেলে আর কিছু খান না—তাও শুনলাম। এই একবার মাত্র খান—এক একদিন তাও হয়ে ওঠে না, এমনিতেও। সকালের রান্না ঘাঁটা ভাত-তরকারি—সাড়ে দশটায় অধিকাংশ সত্রে ভিক্ষা দেওয়া হয়, তারও অনেক আগে রান্না হয়ে থাকে—এক এক দিন এলিয়ে যায় বা টকে যায়। তবে তাতে উনি কোনো অসুবিধা বোধ করেন না। এক আধ দিন উপবাসে আর কি হয়? তাও বলে দিলেন আমাকে।

এর পরে আমি আরও দু'দিন গিয়েছিলাম। বেশী দিন থাকা সম্ভব নয়, এখান থেকে ফেরার দিন ঠিক করে সেইমতো হরিদ্বার থেকে ফেরার টিকিট করতে দিয়েছি—রিজার্ভেশন নষ্ট হয়ে গেলে বিপদে পড়ব।

তবে এর মধ্যেই—ওঁর প্রবল অনিচ্ছাসত্ত্বেও—চাপ দিয়ে ওঁর এই জন্মান্তরের ইতিহাস কিছুটা সংগ্রহ করেছি। তারপর বছর খানেক পরে সময় করে এসে খুঁজে খুঁজে আর পানিপথে ওঁরই দেওয়া ঠিকানা মতো বাকী পাত্র-পাত্রীদেরও খুঁজে বার করেছি। তবে ওঁর কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিলাম যে ওঁর নব জন্মের কথা বা ওঁর ঠিকানা তাদের জানাব না। উনি যে বেঁচে আছেন, বেঁচে গিছলেন তাও জানানো চলবে না।

তা জানাতে পারি নি বলেই সবটুকু ইতিহাসও জানা যায় নি। তাই কল্পনার মশলা দিয়ে সত্যের ফাঁকটুকু ভরাতে হয়েছে।

তবে এমনই যে ঘটে নি, তাই বা কে বলবে? 'কবির মনোভূমি' সত্যের চেয়েও সত্য—রবীন্দ্রনাথই তো সে-সান্ত্বনা দিয়ে গেছেন।

কালিকানন্দ সে বন্যায় মরেন নি। ঘরের মধ্যে শুয়ে থাকলে অবশ্যই মারা যেতেন কিন্তু ওঁরই সৌভাগ্য (বা দুর্ভাগ্যক্রমে) বাইরে একটা খাটিয়া পেতে শুয়ে ছিলেন। তিন দিক চাপা ছোট্ট ঘরে ওঁর আস্তানা, সেখানে খুব শীতের দিন ছাড়া শোওয়া যায় না।

বান বা 'বাঢ়' আসছে শোনা ছিল। ওঁরা ভেবেছিলেন আস্তে আস্তে জল বাড়বে গঙ্গায়—তখন, অবস্থা বুঝে ওপরের দিকে কোথাও যাবার চেষ্টা করলেই হবে। কিন্তু জল এসেছে অকস্মাৎ প্রবল বেগে—পাহাড়ে ছোট নদীতে যেমন আসে তেমনই, ওপরে কোথাও 'ক্লাউড-বার্স্ট'-এর ফল হয়ত—কলকাতায় ভাদ্রমাসে ষাঁড়াষাঁড়ির বানে যেমন একটা উঁচু ঢেউয়ের সঙ্গে সঙ্গে আরও একটা তার চেয়েও উঁচু—তারপর আরও, আরও—ক্ষ্যাপা ষাঁড়ের মতো গুঁতোতে গুঁতোতে ছুটে আসে—এসব জায়গাতেও তেমনি আসে। বছর কতক আগে দিনে দুপুরে ঋষিকেশে ছোট্ট চন্দ্রভাগা নদী পার হতে গিয়ে জনা যাটেক সাধু ভেসে গিয়েছিলেন। কিন্তু গঙ্গা যমুনাতে এমন আসবে তা ওঁরা ভাবেন নি।

গভীর ঘুমের মধ্যে হঠাৎ এসে পড়েছে, ঘুম ভাঙতে ভাঙতে অনেকদূর নিয়ে গিয়ে ফেলেছে। কিছু কিছু চোবানি তো খাবেনই, কিন্তু কালিকানন্দ খুব ভালো সাঁতার জানতেন বলেই শেষ পর্যন্ত ভেসে উঠেছেন এবং সেই কারণেই স্রোত ঠেলে পাড়ের দিকে যাওয়ার চেষ্টা করেন নি, কারণ সে প্রবল এবং ভয়ঙ্কর স্রোত ঠেলে যাওয়া কারও পক্ষেই সম্ভব নয়। ওঁর আশা ছিল যে কিছুদূর এইভাবে গেলে একটা কিছু অবলম্বনের মতো আশ্রয় পাবেন। কারণ জল এখানে যত গভীর—অপেক্ষাকৃত সমতল ক্ষেত্রে গেলে হয়ত তত আর থাকবে না—চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ার ফলে উচ্চতা ও বেগ দুইই কমবে।

এভাবে কতদূর গিয়েছিলেন তা তিনি জানেন না। শুক্লাপঞ্চমীর চাঁদ অনেকক্ষণ অস্ত গেছে, চারিদিকে নিবিড় অন্ধকার, বন্যার বেগে জনপদের আলো অদৃশ্য হয়েছে—ঘরদোর সব ভেসে গেছে, আলো জ্বলবে কোথায়! উনিও কিছু দেখতে পাচ্ছেন না, ঘোলাজলে দৃষ্টি অস্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে, পরিচিত ঘর-বাড়িও চিনতে পারছেন না।

তবে আন্দাজে মনে হয় হরিদ্বার কনখলও ছাড়িয়ে চলে এসেছিলেন, হয়ত এরপর সমতলভূমিতে গেলে দু-একটা বড় গাছপালা অবলম্বন পেতেন কিংবা আধডোবা ঘর বাড়ি। তবে তার আগেই একসময় একটা বড় পাথরে গিয়ে সজোরে ধাক্কা খেলেন, লাগল মাথাতেই বেশী, ফলে

অজ্ঞান হয়ে গেলেন। তবে তার আগেই, এখন মনে হয়, কোনো ভেসে আসা বড়গোছের ডালপালাতে জড়িয়ে গিছলেন - তাতেই প্রাণটা রক্ষা হয়েছিল, নইলে অজ্ঞান অবস্থায় ডুবে যাওয়ারই কথা।

অবশ্য এসব কিছুই উনি জানেন না। মনে নেই। কিছুই মনে ছিল না, এসব এখন মনে পড়ছে—সে রাত্রের কথা। এই নব জন্মান্তরের কিছুই জানতেন না, কোনো স্মৃতিই তখন ছিল না। জ্ঞান হয়ে একটু একটু করে যা বুঝতে পেরেছিলেন—চোখ খুলে দেখারও বেশ খানিকটা পরে—এক পাকা বাড়িতে, সাধারণ মধ্যবিত্ত গৃহস্থ বাড়ির একখানা ঘরে উনি শুয়ে আছেন। খাটিয়ার ওপর, হয়ত সামান্য শয্যা, পাশে টুলের ওপর কি ওষুধপত্র; কে একজন ডাক্তার আর-একটা টুলের ওপর বসে একটা কি ইঞ্জেকশান দিচ্ছেন।

প্রথমত এটা কি ঘটনা তাই বুঝতেই যথেষ্ট সময় লেগেছিল। এ কোথায় তিনি আছেন ? এরা কে কী করছে ? মনে হচ্ছে তো চিকিৎসার আয়োজন, কিন্তু কেন ? কি অসুখ হয়েছে তাঁর ?

তার চেয়েও বড় কথা—তিনি কে ? কোথা থেকে এখানে এলেন, কেন এলেন, এরা কে—এটা বোঝার আগে নিজের পরিচয় ও অবস্থান, এবং যে ঘটনা পরম্পরায় অসুস্থ হয়ে এখানে এসেছেন—সেটা জানা দরকার। না, কিছুই মনে পড়ছে না। সবটাই—ঝাপ্‌সা নয়—একেবারে অন্ধকার। কিছুক্ষণ বোঝার জানবার চেষ্টা করে ক্লান্ত হয়ে চোখ বুজলেন।

ডাক্তার ইঞ্জেকশান দিয়ে বলে গেলেন, হিন্দীতে বললেন, বিশেষ উর্দু-মেশানো হিন্দুস্থানী বলেই আরও বোঝার সুবিধা হলো, 'এইবার জ্ঞান আসছে একটু একটু করে। মনে হয় আজকের মধ্যেই পুরো জ্ঞান এসে যাবে। তবে সাবধান, ওঠবার বা মাথার ব্যাণ্ডেজ খোলার না চেষ্টা করে। আজও লিকুইড পথ্য চলবে, আমি কাল এসে দেখে তবে অন্য পথ্যের ব্যবস্থা করব।'

কোথায় যেন রুপোর টাকা হস্তবিনিময়ের শব্দ হলো। ডাক্তার চলে গেলেন বোধহয়।

আবার যখন চোখ খুললেন উনি, দেখলেন, একটি বৃদ্ধ হিন্দুস্থানী ভদ্র-

লোক—উজ্জ্বল গৌরবর্ণ, শুভ্র কেশ, প্রশান্ত হাসি-হাসি মুখ—পাকা আমের সঙ্গে যে চেহারার তুলনা দেওয়া হয় সেই ধরনের চেহারা, ঝুঁকে পড়ে দেখছেন। ওঁকে চোখ চাইতে দেখে, সোজা হয়ে হাত তুলে কাকে যেন প্রণাম করলেন। বললেন, 'জয় রামজীকি, জয় গঙ্গামায়ীকী—আব তো ফিন হুঁশ চলা আয়া। এ যমুনা কি মায়ী, আও আও দেখো—তুমহারী লেড়কাকা হুঁশ আ গিয়া!'

সে শব্দে একটি বৃদ্ধাও ছুটে এলেন ঘরের মধ্যে। এঁরও পাকা চুল, উজ্জ্বল গায়ের রঙ, চোখমুখও কাটা কাটা, বয়সকালে যে সুন্দরী ছিলেন তাতে সন্দেহ নেই। তিনিও ঝুঁকে পড়ে গঙ্গামায়ীকে ধন্যবাদ দিলেন সরবে—তারপর পাশে বসে পড়ে গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন। বোধহয় আনন্দেই এবং গঙ্গামায়ীর কাছে কৃতজ্ঞতায়—দু'চোখ বেয়ে জল ঝরতে লাগল।

নিজের পরিচয় না পেলেও এঁদের পরিচয় পেলেন কালিকানন্দ—পরিচয় এবং কিছুটা ইতিহাস এঁদের দিককার। তাঁর ইতিহাস তখনও শূন্য, অন্ধকার।

এঁরা ওর নাম দিয়েছেন মাতাপ্রসাদ। গঙ্গামায়ীর প্রসাদ বলেই এই নাম দিয়েছেন এঁরা।

প্রথমটা পরিচয় জানতে চেয়েছিলেন বৈকি। অনেক জিজ্ঞাসাবাদও করেছিলেন। প্রথম প্রথম খুব বেশী নয়—পরে, শরীর আরও সুস্থ সবল হয়ে উঠতে অনেক রকমে চেষ্টা করেছিলেন স্মৃতি ফিরিয়ে এনে পরিচয় জানতে। নিজেরাও কিছু কিছু তথ্য যুগিয়ে দিয়েছিলেন—যাতে বিস্মৃতি-বিহ্বলতাটা কেটে যায়।

না, কোনো কাপড় জামা ছিল না দেহে। শোনা গেছে একটি কৌপীন মাত্র ছিল, তার রঙটা হয়তো গেরুয়া। হয়তো বলার অর্থ—ঘোলা গৈরিক বর্ণের বন্যার জল, তাতে সাদা কাপড়ও গেরুয়া দেখায়।

এ বৃদ্ধ ভদ্রলোকের নাম পণ্ডিত রুক্মিনীনাথ শর্মা, কাশ্মীরী ব্রাহ্মণ, বিজনোরে বাস করতেন, জমি জায়গা ছিল। গরু ভৈঁস নিয়ে বেশ

স্বচ্ছন্দেই চলে যেত। একটিমাত্র ছেলে ছিল রঘুবর, জোয়ান ছেলে, বিয়েও করেছিল, একটি বাচ্চা তার স্ত্রীর গর্ভে—কোথায় হারিয়ে যায়। টনকপুরে তার কে বন্ধু থাকত, চাকরি উপলক্ষে গিয়েছিল—তার অসুখ শুনে রওনা হয়ে যায়। কিন্তু টনকপুরে পৌঁছয় নি, শেষ তাকে দেখা গেছে নাজিবাবাদ স্টেশনে—তারপর কোথায় গেছে কেউ জানে না। কোথাও কোনো দুর্ঘটনায় মারা গেছে কিনা কিংবা কোনো খুনে লুটেরার হাতে পড়েছে কিংবা সাধু হয়ে চলে গেছে তার কোনো খবরই পাওয়া যায় নি তার।

সে গেছে যখন তার পঁচিশ বছর বয়স, আজ থাকলে এই মাতাপ্রসাদের বয়সই হতো। চেহারার সঙ্গেও খুব সাদৃশ্য আছে। সে তখন খুব গৌরবর্ণ ছিল, মাতাপ্রসাদের রঙ হয়ত এককালে উজ্জ্বলই ছিল, এখন একটু তামাটে রোদ-পোড়া হয়ে গেছে। হয়ত রঘুবর থাকলে তারও এমনি রঙ দাঁড়াত।

রঘুবরের মায়ের ধারণা—তাঁর হারানিধিই এমনি অভাবনীয়ভাবে ফিরে এসেছে তাঁর কাছে। তাঁর বুক-ফাটা কান্নাতেই গঙ্গামায়ীর আসন টলেছে—তিনি বন্যায় জলে ভাসিয়ে এনে দিয়েছেন ওঁর কোলে।

তাছাড়া আর কীই বা বলা যায়। যে নাজিবাবাদে ছেলে হারিয়ে ছিল সেইখানেই তো পেলেন। তাঁরা কিছুদিন ধরেই গঙ্গার তীরে তীরে ঘুরছেন। নাজিবাবাদ ভালো লাগে নি—হরিদ্বারেও বাস করায় খুব অসুবিধা তাই লুকসার আর নাজিবাবাদের মাঝামাঝি বেশ খানিকটা জায়গা কিনে এখানেই ছোটখাট একটি বাড়ি করেছেন। সামান্য একটু চাষবাসও হয়—বেশির ভাগই সবজি আর ফল, যা জনা দুই মজুর দিয়েই করানো যায়। তাতেই ওঁদের বেশ চলে যায়। দুটো গরু আছে, দুধ খান তাঁরা—কিছু বিক্রিও হয়। এছাড়া বিজনোরের সম্পত্তি বিক্রি করে কিছু টাকাও পেয়েছেন, তার অর্ধেকটা পুত্রবধূ আর নাতির নামে জমা করে দিয়েছেন, বাকী অর্ধেকটা রেখেছেন মেয়ে যমুনার নামে। যমুনার বয়স এখন প্রায় সতেরো, এঁদের হিসেবে বিয়ের বয়স পার হয়ে গেছে—কিন্তু ছেলে গেছে, মেয়ে পরের বাড়ি গেলে বাঁচবেন কী করে এই

ভেবেই গড়িমসি করেছেন।

বন্যার ঠিক আগে ওঁরা হরিদ্বারেই গিয়েছিলেন পিতৃপক্ষের শেষ তর্পণ করতে। তার পরও কদিন থাকার ইচ্ছে ছিল, নবরাত্রি কাটিয়ে আসবেন ভেবেছিলেন এমন সময় বন্যার খবর এলো। মেয়ে বৌকে রেখে এসেছেন বাড়িতে—তাড়াতাড়ি ফিরলেন, কিন্তু ফিরেও নিশ্চিন্ত হতে পারলেন না। যেভাবে গঙ্গার জল বাড়ছে তাতে এসব এলাকাও ডুববে, তাঁদের একতলা নিচু বাড়ি, কোনো নিরাপত্তাই নেই—অনেকেই নাজিবাবাদে গিয়ে আশ্রয় নিচ্ছে শুনে তাঁর গরুগুলোকে মাসির সঙ্গে পাহাড়ে পাঠিয়ে দিয়ে নাজিবাবাদ চলে এসেছিলেন। আর, অন্য কোথাও না আশ্রয় পেয়ে স্টেশনেই কোনোমতে একপাশে, একটু জায়গা করে নিয়েছিলেন। সপ্তমীর দিন খবর পাওয়া গেল, কনখল্ ঋষিকেশ অঞ্চলের বহু সাধু ও দরিদ্রলোক যারা গঙ্গার ধারে সামান্য কুটির বানিয়ে থাকত একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। কত যে লোক মরেছে তার ঠিক নেই। বিশেষ সাধুমহাত্মারাই মরেছেন বেশিরভাগ। অনেক বিচিত্র দৃশ্যও চোখে পড়েছে লোকের—কুটিরের চালা ভেসে যাচ্ছে তাতে একই সঙ্গে মানুষ আর বাছুর কুকুর আশ্রয় নিয়েছে, হয়ত সাপখোপও সেই সঙ্গে উঠে বসেছে—তবে তাদেরও বাঁচানো সম্ভব হচ্ছে না। জলের যে প্রচণ্ড স্রোত, ভৈরবগতি, কার সাধ্য সাঁতরে যায়। কোনো মোটরলঞ্চ বা স্টিমলঞ্চ থাকলেও চেষ্টা করা যেত—সে এখানে কোথায়?

তবে 'রাখে হরি মারে কে' এর একটা প্রত্যক্ষ প্রমাণের খবর সেই দুঃখের ও হতাশার মধ্যেও ভয়ার্ত গৃহহারা নরনারীদের একটু উত্তেজনার খোরাক যোগাল। একটা বড় পিপল গাছ নাকি জলের তোড়ে উপড়ে ভেসে যাচ্ছিল, তারই ডালপালায় কে একটা মানুষ জড়িয়ে গিয়ে ভেসে এসেছে আর গাছটা যেন লোকটাকে বাঁচাতেই সোজা না গিয়ে এদিকের কম জলে এসে গিয়ে এক জায়গায় আটকে গেছে। তবে লোকটার মাথায় ভীষণ চোট লেগেছে কোথাও। তাই প্রাণটা থাকলেও অজ্ঞান হয়ে আছে, আর যা অবস্থা—বোধহয় বাঁচবেও না। খুব একটা দেখ্‌ভাল' করলে হয়ত বাঁচত—কিন্তু এই আতান্তরের মধ্যে কে অত

কাণ্ড করবে। সরকারী ডাক্তাররা নাইবার খাবার সময় পাচ্ছেন না, তাঁরা সংখ্যায় অতি অল্প, ওষুধ-পত্র ও অন্যান্য সরঞ্জামও সামান্য। এ-রকম কাণ্ড ঘটবে, এই ছোট্ট জায়গায় এতগুলো লোক এসে পড়বে, তা কে জানত।

কৌতূহলবশতই যমুনার মা দেখতে গিছলেন অন্য দু'চারজনের সঙ্গে কিন্তু লোকটাকে দেখামাত্র কেঁদে হেসে চেঁচিয়ে সে এক কাণ্ড বাধিয়ে বসলেন। তাঁর ছেলে, হ্যাঁ তাঁরই ছেলে তাঁর কোলে ফিরে এসেছে। রুক্মিনীনাথও খবর পেয়ে ছুটে এলেন। তিনি নিঃসন্দেহ ন' হলেও যমুনার মার এই ব্যাপার দেখে সেকথা বলতে পারলেন না, দু-একজনের সাহায্যে স্টেশনে নিয়ে এলেন এবং একজন যে বেসরকারী ডাক্তার কাছে ছিলেন, তাঁকেই ভিজিট দিয়ে ডেকে আনলেন।

এমনিই তো অপরিচিত লোক, আত্মীয় বান্ধবহীন, এখানে কে-ই বা সেবা করবে, কতটুকুই বা চিকিৎসা সম্ভব হবে—তাই পুলিশ বা সরকারী ডাক্তাররাও কোনো বাধা দিলেন না বরং যেন বেঁচে গেলেন।

স্টেশনে এমন রুগীর চিকিৎসা হয় না। তাই রঘুবরের বাবা খোঁজ করে অপেক্ষাকৃত নিরাপদ স্থানে দুটো ঘর কেরায়াতে নিলেন। আশ্রয়প্রার্থী অনেক, কিন্তু টাকা দিয়ে বাড়ি নেবার মতো লোক নেই। বাড়িও'লা যা সামান্য পেলেন তা তো পেলেনই, জবরদখলের ভয় রইল না—এইভেবে বেশ যে সাগ্রহে ভাড়া দিলেন তাই নয়—নিজে গিয়ে হেপাজত করে মাল মানুষ সব নিয়ে তুললেন। সেই থেকে এখানেই আছেন ওঁরা। ডাক্তার যথেষ্ট চেষ্টা করছেন এ কদিন কিন্তু আশা খুব একটা দিতে পারেন নি। কেবল রঘুবরের মা বলেছেন, 'না, মাতাজী যখন কৃপা করে আনিয়ে দিয়েছেন তখন বাঁচিয়েও দেবেন, দেখে নিও তোমরা।'

যেন তাঁর বিশ্বাসেই গঙ্গামায়ীর করুণা হলো। এগারো দিন পরে লোকটি চোখ খুললো, সে চোখে কৌতূহল ও জিজ্ঞাসার চিহ্নও ফুটে উঠল ক্রমশ। কিন্তু ফিরে এলো না স্মৃতির কোনো লক্ষণ।

'আমি কোথায়' এ প্রশ্ন তো প্রথম। 'কি করে এলুম' 'আপনারা কারা', 'কেমন করে পেলেন, এ জায়গাটা কি'—এসব ক্রমশ।

কিন্তু 'তুমি কে, কোথায় থাকতে, কি করে এ গাছের সঙ্গে জড়িয়ে গেলে, মাথায় চোট লাগল কি করে'—এ প্রশ্নর কোনো উত্তরই দিতে পারে না মাতাপ্রসাদ। ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে শুধু। ভাবার চেষ্টা করে। মনে করতে না পেরে যে কষ্ট হয় সেটাও বোঝা যায় মুখ দেখে—বিশেষ দৃষ্টি—কিন্তু তবু মনে পড়ে না। সাধু কি গৃহী, কি কাজ করত, বিবাহিত কিনা—ছেলেমেয়ে হয়েছিল কিনা—এঁরা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে অনেক প্রশ্ন করেন, যাতে স্মৃতি তার সূত্র খুঁজে পায়—যেন মনে হয় কিছুদূর পর্যন্ত এগিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু কিছুদূর গিয়ে একটা নীরেট নিরন্ধ্র দেওয়ালে যেন ধাক্কা খেয়ে ফিরে আসে।

এঁদের যে ডাক্তারটি—তিনি স্পষ্ট স্বীকার করলেন এমন 'কেস' তাঁর হাতে এর আগে আর আসে নি। মাথার ঘা ক্রমশ সেরে উঠছে, হাড়-টাড় কোথাও ভেঙেছে বলেও মনে হয় না—অথচ এমন স্মৃতি নষ্ট হলো কেন? তিনিও তাঁর সাধ্যমতো চেষ্টা করেন মনে করাতে নানা রকম বৃত্তির কথা। মনে করাতে চেষ্টা করেন, কোনো দোকানের কথা মনে পড়ছে কিনা, মুদীর দোকান, মশলার দোকান, কাপড়ের দোকান, জুতোর, চা, জলখাবার, মিঠাই—সব রকমের কথাই বললেন ঘুরিয়ে ফিরিয়ে। কোনো দোকানে কিভাবে জিনিসপত্র সাজানো থাকে—তাও মনে করাবার চেষ্টা করলেন, শেষ পর্যন্ত ভুজাওয়ালার দোকানের কথাও পাড়লেন। কিন্তু মাতাপ্রসাদের চোখ থেকে বিহ্বলতা কাটল না কিছু-তেই। শেষে ডাক্তার উপদেশ দিলেন বোম্বাই কি কলকাতায় নিয়ে গিয়ে মেডিকেল কলেজে দেখাতে।

সে সামর্থ্যও এঁদের ছিল না। ইচ্ছাও না। বিশেষ করে মায়ের মস্ত বড় সান্ত্বনা, গঙ্গামায়ী তাঁর হারানিধিকে পাইয়ে দিয়েছেন, এ ব্যবস্থাও তিনিই করবেন। তাছাড়া, স্মৃতি ফিরে এলেই যদি পাখী আবার পালায়? বরং এখানে কিছুদিন থাক, মন বসুক, বাচ্চাটা হয়েছে তার ওপর মায়া পড়ুক—তখন স্মৃতি ফিরে আসুক তাতে ক্ষতি নেই।

আর একেবারে না আসে, সেও ভালো একরকম। তাঁর ছেলে হয়ে ঘরে থাক। এ ক'বছর কোথায় ছিল কি করেছে তা নাই বা জানলেন তাঁরা।

ওরই বা মনে পড়ে লাভ কি ? ওঁদের কোনো কাজে লাগবে না, ওঁদের দুঃখের কাল সেটা।

কিছুদিন পর ওঁরা জল সরতে নিজেদের বাড়ি ফিরে গেলেন।

মাতাপ্রসাদের মা যত নিশ্চিন্ত, রুক্‌মিনী ততো নিশ্চিন্ত হতে পারছেন কৈ ? পুত্রস্নেহে ও আগ্রহে মায়ের দৃষ্টি আচ্ছন্ন হয়ে গেছে, অথবা ইচ্ছা করেই তিনি চোখ বুজে থাকছেন দেহের বিশেষ চিহ্নগুলো মেলাতে চেষ্টা করছেন না। বাপ মা যাঁরা জনম থেকে কোলে করেছেন, বুকে করেছেন তাঁদের সব চিহ্নই জানা আছে অবশ্য, অত্যন্ত চেষ্টা করলে মনে পড়বে। কানের কাছে একটা ছোট্ট আঁচিল ছিল, ঈষৎ লালচে আঁচিল। তবে সে আর নেই, সেটাও ঐ চোটে কেটে গেছে, সেখানে এখন একটা ক্ষত-চিহ্ন শুধু তা থেকে আঁচিল প্রমাণ হয় না। কথা বলার সময় ঠোঁটদুটো একদিকে বিশেষ ভঙ্গিতে ঈষৎ বেঁকে যেত—ঠিক তেমন না হলেও এরও একটু সেরকম বাঁকে। এমন একটা খুব স্পষ্ট এবং দৃষ্টিকটু ছিল না, সেটা বাপ মা বা স্ত্রী ছাড়া কারও অত লক্ষ্য পড়ার কথা নয়। স্ত্রীও বললো যেন কতকটা সেই রকমই।

আর একটা চিহ্ন স্ত্রীর জানা ছিল, পুরুষাঙ্গর উপর একটি তিল—লজ্জায় সে কথাটা শাশুড়ির কাছে বলতে পারল না, ওঁদের অত মনে নেই।

আসলে আরও সে কথা মনে করবার চেষ্টা করল না বোধহয় এইজন্যে যে, এ লোকটি যে তার সেই স্বামী সে সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহ থাকলেও শাশুড়ির বিশ্বাসটাকে সে বাধা দিতে চায় না। তার জীবনটা তো এই বয়েসেই নষ্ট হতে বসেছে—যদি ডোবা নৌকো একটা কূল পায় তো মন্দ কি, শ্বশুর শাশুড়িই যদি ছেঁড়া মালা আবার গেঁথে দেন কারুর কিছু বলবার থাকবে না। কেউ যদি কানাকানি করে ? করুক না, করতে করতে দিনকতক পরে আপনিই চুপ করে যাবে। একঘরে করবে ? তা বোধহয় পারবে না—এদিকেও যেমন প্রত্যক্ষ প্রমাণ নেই, ওদিকেও তেমনি নেই।···আর সে যা হয় করুক, ওর জীবনের নৌকো

কি তারা কূলে ভেড়াবে কেউ ? ওর জীবনটা যে নষ্ট হতে বসেছে—তার জন্যে কি কারও খাওয়া-দাওয়া আমোদ-আহ্লাদে এতটুকু ত্রুটি ঘটছে !

ঠিক এভাবেই সে হিসেব করেছিল কিনা সরস্বতী—সেটা মাতাপ্রসাদের বা আমাদের অনুমান, তবে সে প্রচুর 'ঘুঙট' দিয়েও, অর্থাৎ মুখ খুলে দাম্পত্য আলাপের মতো সোজাসুজি কথাবার্তা বা গল্প না করেও, নিটোল সেবা শুশ্রূষা করতে লাগল। বস্তুত সে-ই করত—মাতাপ্রসাদের মার ঠিক অনেক বয়স না হলেও ছেলে হারাবার পর মানসিক দুঃখে যেন বুড়িয়ে গিছলেন, যত সাধ ছিল তত সাধ্য ছিল না, বধূ সরস্বতীই সব করত। একটু বেশী রকমই করত হয়তো।

এতটাই কি সেবা করে স্ত্রীরা ?

কে জানে। কালিকানন্দের তো অভিজ্ঞতা নেই কোনো। অভিজ্ঞতা যে নেই তাও তো জানেন না। সন্ন্যাস জীবনেও তিনি তাঁর গুরুর মতো গৃহস্থদের সঙ্গে অন্তরঙ্গভাবে মেশেন নি। আশ্রমে শিষ্যরা আসত সপরিবারে—এই পর্যন্ত দেখেছেন, কারও গৃহস্থজীবনের মধ্যে প্রবেশ করেন নি। বরাবরই দূরে দূরে থেকেছেন। ওরা কেউই তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করার চেষ্টা করেন নি। বাল্যজীবনটা কেটেছে রুগ্ন মা আর এক বৃদ্ধা মাসীর কাছে—যত্ন পাবার কথা নয়, পানও নি। তাই এ যত্নের সবটাই অভিনব লাগে, ভালো লাগে।

সুন্দরী নয় সরস্বতী—তবে সুশ্রী। গৌরাঙ্গী সুগঠিত দেহ, মুখখানিতে যৌন আকর্ষণ কতটা আছে কে জানে, স্নেহ ও মাধুর্য আছে—তা এক-আধবার ঘোমটা সরে যাবার ফাঁকে চোখে পড়েছে।

এত নিখুঁতভাবে এমন সেবা যে মানুষ মানুষকে করতে পারে—তা উনি এই প্রথম দেখলেন এবং মুগ্ধ হলেন। এমনও মনে হতে লাগল, যদি এঁদের কথাই সত্য হয়—উনি এই সুশ্রী সেবাময়ী মধুর স্বভাবা স্ত্রী ছেড়ে পালিয়ে ছিলেন কী করে !

কালিকানন্দ চিরদিনই পশ্চিমে মানুষ, হিন্দী কথাটাতেও কোনো অসুবিধা হয় না। এটা যে ওঁর ভাষা নয়—তা ওঁরও মনে আসে না, এঁরাও

উনি যে বাঙালী তা সন্দেহ করেন না।

উভয়ের এই আসক্তি বা প্রীতি লক্ষ্য করে যমুনার মা মাঝে মাঝেই স্বামীকে বলেন, 'ওদের এবার একসঙ্গে শোওয়াবার ব্যবস্থা করো না। আর বাধা কিসের?'

রুক্মিনীনাথ রাজী হন না। বলেন, 'ষোলআনা প্রমাণ পাওয়া দরকার। এ একটা বংশের সম্মানের প্রশ্ন। বিধবা হয়ে গেছে বৌমা নিশ্চিত জানলে আবার বিয়ে দিতুম, তাতে এ কথা উঠত না। কিন্তু এখনও তো বারো বছর কাটে নি, তাও তো দিতে পারছি না।'

ক্ষুণ্ণ হন মাতাপ্রসাদের মা, তবে প্রবল কোনো বাধাও দিতে পারেন না। কে জানে, হয়ত তাঁরও মনে কোথাও একটা ছোট্ট সংশয় আছে—হয়ত সেটা মাথা তোলার পথ বন্ধ করতেই তিনি অন্য কোনো ব্যবস্থা পাকা-পাকি করতে চাইছেন।

হয়তো একসময় রুক্মিনীনাথের আপত্তিও ক্ষীণ হয়ে আসত—সংসারের ভার উপযুক্ত ছেলের হাতে তুলে দিয়ে নিশ্চিন্ত হওয়ার ইচ্ছা কি তাঁরও নেই?—কিন্তু আবার একটা আঘাত, একটা ঝড় এলো অন্যদিক থেকে। প্রবল ঝড়, ঘুর্ণিবাত্যা বলাই হয়ত উচিত।

আসলে সুখী হওয়া, নিশ্চিন্ত হওয়া বিধাতা ওঁদের ভাগ্যে লেখেন নি। সে ঝড়—এঁদেরই মেয়ে যমুনা।

যমুনা একেবারে শ্যামাঙ্গী না হলেও এঁদের তুলনায় তার রঙ অনেক নিরেস। যমুনা নাম সেইজন্যেই হয়তো রেখেছিলেন।

কিন্তু বর্ণের ন্যূনতা অবয়ব ও লাবণ্যে পুষিয়ে দিয়েছিল। এমন লাবণ্য-বতী মেয়ে সচরাচর চোখে পড়ে না। পূর্ণ যৌবনের বয়স না এলেও দেহে পূর্ণ জোয়ার এসে গিছল অনেক আগেই। তার চেয়েও যেটা বড় কথা—প্রাণচঞ্চলতা, প্রাণ-উচ্ছলতা। এ মেয়ে যেখানে গিয়ে দাঁড়ায় সমস্ত দুঃখ দুশ্চিন্তা ভবিষ্যতের ভাবনা বর্তমানের সমস্যা যেন ভেসে উড়ে চলে যায়। মনে হয় জীবনে হাসিখুশি ঠাট্টা-তামাশা শখ-শৌখিনতা ছাড়া আর কিছু নেই।

মাতাপ্রসাদও ওকে দেখেছেন, বুঝি কিছুটা মুগ্ধও হয়েছেন।

মুগ্ধ হয়েছেন মানে আর কিছু বোঝেন নি, ভালো লাগে, ওকে দেখলে অকারণেই আনন্দ হয় এটা বুঝেছেন। সরস্বতী সম্বন্ধে যে আকর্ষণ সেটা অনভ্যস্ত অজ্ঞাত অভিজ্ঞতার—সেবা ও যত্নের। যমুনাতে অন্য আকর্ষণ, অন্য রকম বিস্ময়।

প্রথম প্রথম—যখন মাতাপ্রসাদ অজ্ঞান তখন তো যমুনার এঘরে আসবার কোনো প্রশ্নই ছিল না। পরে অল্পস্বল্প করে জ্ঞান হয়েছে যখন, তখনও ঈষৎ কৌতূহলী হয়ে মধ্যে মধ্যে বিছানার পাশে এসে দাঁড়াত এই পর্যন্ত। মা যে এমন জোর করে বলছেন এ-ই তাঁর হারানিধি, কোন্ সাদৃশ্য দেখে বলছেন সেটাই দেখার জন্য বেশ আগ্রহ তাঁর। তবে তখনও মাথায় ব্যাণ্ডেজ, তখনও ওঠা-হাঁটা বারণ। কথাও মাতাপ্রসাদ বিশেষ বলতে চায় না—ওর তত ভালো লাগত না। অসুখ বিসুখের আবহাওয়া ওর কখনই ভালো লাগে না—সেবার কাজটা ভাবীই বোঝে ভালো, ও-ই করুক। স্বাভাবিক কৃত্যগুলো মা করেন, কখনও বাবা করেন—সেবার বাকী সব কাজই করে সরস্বতী।

কিন্তু একটু একটু করে যখন উঠে বসল মাতাপ্রসাদ, কাটা ঘা শুকিয়ে গেল, চুল বড় হয়ে তার কুৎসিত দাগগুলোও ঢেকে দিল, দৃষ্টিতে ফিরে এলো আগ্রহ আর কৌতূহল ; দেখার আগ্রহ জানবার কৌতূহল। তার একটিই মাত্র অর্থ হয়—ঈপ্সা। এসব ঐ মনোভাবেরই লক্ষণ।

এবার যমুনার ভালো লাগে, সেও এই লোকটা সম্বন্ধে সচেতন হয়ে ওঠে। আস্তে কথা বলে, শান্ত স্বভাবের মানুষ কিন্তু রসিকতা করলে বোঝে, খোঁচা মারলে পালটা খোঁচা দিতে পারে। প্রথম বয়েস আর নেই লোকটার, তবু—এর চেয়ে কম বয়েসের আর কাকে পাচ্ছে হাতের কাছে? এতদিন পরে হাতের কাছে বলতে গেলে এই প্রথম একটা পুরুষকে পেল।

হ্যাঁ। পুরুষই। ভাই নয়। ভাই যে নয় সে সম্বন্ধে যমুনার মনে অন্তত কোনো সন্দেহ ছিল না। ভাইকে সে অনেক দিন দেখে নি সত্য কথা—ভাই যখন চলে গেছে যমুনা তখন ছোট্ট। সে সময়ের কথা মনে থাকলেও অত খুঁটিনাটি কথা মনে নেই। আর নিজের ভাই, এক বাড়িতে থাকে,

কে কবে সে ভাইয়ের চেহারার এত খুঁটিনাটি লক্ষ্য করে বা মনে করে রাখে। মা বাবা মুখে যাই বলুন, তারাও যে নিশ্চিত বিশ্বাস করেন তা নয়, তাহলে সোজাসুজি সেটা বলেন না কেন লোকজন ডেকে, ভাবী-কেই বা ওর ঘরে থাকার ব্যবস্থা করেন না কেন!

না, ও সব কিছু নয়। এমন গল্পই শোনা যায়, আষাঢ়ে গল্প, কারও হারানো ছেলে এমন বানভাসি হয়ে ফিরে আসে সত্যিসত্যিই, ঈশ্বর এনে দেন, কে কবে দেখেছে? ঐ যারা এসে গল্প করে কেউ তার চাচেরা বোনের ফুফাতো শাশুড়ির কাছে শুনেছে, তিনি আবার শুনেছেন আর একজনের কাছে। ধ্যেৎ। ঝুট, সব ঝুট।

না, পুরুষ একজন, তাই ভাবাই ভালো। প্রথম একটা পুরুষ এলো জীবনে।

এর আগে বিজনোরে ওর পাঠশালার যে সব বন্ধু ছিল তাদের দাদারা এতদিনে নিশ্চয় বড় হয়েছে, যুবক হয়েছে—তাদের কাছে থাকলে, আসা-যাওয়া থাকলে পুরুষ সম্বন্ধে এত আগ্রহ, অভীপ্সা থাকত না। সেখান থেকে বেরিয়ে কত জায়গায় ঘোরা, তারপর এখানে এসে থাকা—লেখাপড়াও হলো না, লেখাপড়ার সূত্র ধরে যে বাইরের লোকের সঙ্গে পরিচয় ঘটে তারও কোনো সুযোগ মিলল না।

এ লোকটা সম্বন্ধে সেই কারণেই ওর প্রতি কৌতূহল, লোকটাকে জান-বার তার ভেতরটা বোঝবার তাই এত আগ্রহ।

লেখাপড়া জানে কিনা তা এখনই বোঝা যাচ্ছে না। তবে কথাবার্তায় তো মনে হয় বিশেষ ভদ্রলোক। স্মৃতি ফিরে আসবেই, এক এক সময় মনে হয় যেন কী একটা খেই মনের খুব কাছে এসে গেছে, সে সময়-টায় কেমন যেন পাগলের মতো হয়ে ওঠে, সেটা ধরতে চেষ্টা করে—আবার সব শূন্য হয়ে যায়, হতাশায় ভেঙে পড়ে।

এইভাবেই হঠাৎ একদিন আচমকা এসে যাবে পূর্ব জন্মের সব স্মৃতি। তখন হয়ত দেখা যাবে উকিল ছিল লোকটা, কি ডাক্তার—কী সর-কারী দপ্তরের বড় অফ্‌সার। লেখাপড়া জানে, বাড়ি ঘর আছে, আত্মীয়স্বজন—

ভাবতে ভাবতেই মনে পড়ে যায়—হয়ত স্ত্রী-পুত্রও আছে। সেটা ভালো লাগে না ভাবতে। তখন মনে হয় স্মৃতি না ফেরাই ভালো।

দেখতে খুব ভালো নয়। তবে খারাপই বা কি। হয়ত ব্যায়াম করত এককালে, বুকের ছাতি আর হাতের গুলির গঠন ভালো। দাঁত ভালো, সাজানো ঝকঝক করছে, হাসলে মিষ্টি দেখায়।

ঠিক এমন হিসেব করেই যে আকৃষ্ট হয়েছে তা নয়। আগে আকৃষ্ট হয়েছে, তার কারণ আর কৈফিয়ৎ গড়ে তুলেছে মনের মধ্যে।

আরও আকর্ষণের কারণ—সেটা অত ভাবে নি, পরবর্তী কালে ভেবে দেখেছে, স্বীকারও করেছে—সরস্বতী সম্বন্ধে মাতাপ্রসাদের সকৃতজ্ঞ আকর্ষণ। সেটা প্রচ্ছন্নই থাকার কথা, কিন্তু যমুনা ও যমুনার মার কাছে প্রচ্ছন্ন থাকবে কেন? এসব জিনিস মেয়েদের চোখে চাপা থাকে না। এটা যেন—সম্পূর্ণ অকারণেই—যমুনার কাছে স্পর্ধা বলে মনে হয়েছে। সে থাকতে, সরস্বতীর থেকে কমবয়সী, বেশী লাবণ্যবতী, কুমারী—সরস্বতীর দিকে আকৃষ্ট হবে কেন লোকটা। আর সরস্বতীই বা ওর ওপর টেক্কা মারবে কিসের জন্যে।

সে তাই 'সর্বপ্রযত্নে' যাকে বলে সরস্বতীর দিক থেকে ওর দিকে মাতাপ্রসাদের আকর্ষণকে আকৃষ্ট করতে উঠে পড়ে লাগে। সেটা মাতাপ্রসাদের স্বাভাবিক যৌবনতৃষ্ণাকেই যেন বাড়িয়ে দেয়।

একদিন রাত্রে খাওয়ার পর মশারি গুঁজে দিতে ঘরে এসেছিল সরস্বতী, হ্যারিকেনটা বাইরে ছিল। গোয়ালের কাজ সারা হয় নি, যে লোকটি করে, সে মাঠে গেছে প্রাকৃতিক কাজ সারতে—ফিরে এসে গোয়ালে ধোঁয়া দিয়ে টিনের দরজা বন্ধ করবে। সেজন্যে বাগানের দিকের দোরও খোলা ছিল। আলোটা দরকার। শ্বশুর শুয়ে পড়েছেন, শাশুড়ি নাতিকে নিয়ে শুয়েছেন। যমুনা ওর সঙ্গে শোয়, সে একটা প্রদীপের আলোয় বই পড়ছে, কিস্‌সার বই, কোথা থেকে চেয়ে এনেছে।

নির্জন, নিভৃত অবসর। অনেকদিন পর এমন একান্তে পাওয়া।

সরস্বতীর রক্তে তো দোলা লাগবেই। স্বামী কিনা সে সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহ না হলেও সে স্বামীর মতোই সেবা করেছে। অনেক দুঃখ

পার হয়ে এসেছে তার হারানিধি—শুধু যদি লোকটা একটু আগের কথা মনে করতে পারত, যদি চিনতে পারত তাহলে সে বুকের রক্ত দিয়ে পুজো দিত গঙ্গামায়ীকে।

কিন্তু ইচ্ছা যেখানে প্রবল, সেখানে দ্বিধা সঙ্কোচ সংস্কারের বাঁধ বেশী দিন থাকে না। মশারি টাঙাতে গিয়ে হাত থেকে একটা কোণের দড়ি খসে পড়ে, সেটা তোলার চেষ্টায় সবটাই উঠে যায়। অল্প হেঁট হয়ে অল্প আলোতে দেখার চেষ্টা করে মাতাপ্রসাদ জেগে আছে কিনা।

মাতাপ্রসাদ শুধু জেগে ছিল না, চেয়েই ছিল। তারও রক্তে এ কি উত্তালতা জেগেছে, সে ঠিক বুঝতে পারছে না। পূর্বজন্মের—পূর্ব জন্ম ছাড়া আর কি—কথা মনে না পড়লেও এঁদের আচারে আচরণে পাঁচজনের কথাবার্তায় সংসারের রীতিনীতি নিয়ম-কানুন অনেকটা বুঝে নিয়েছে। কিন্তু স্ত্রী-পুরুষের এই আকর্ষণ অপরের কথা থেকে বোঝা যায় না—অন্তরঙ্গ সমবয়সী বন্ধু ছাড়া, সেও তরুণ বয়সের বন্ধু হওয়া দরকার—কাজেই এই চাঞ্চল্য অস্থিরতা—যেন একটা দৈহিক যন্ত্রণা—কিসের, আবৃত গোপন দেহাংশের আকস্মিক পরিবর্তন কেন, ঠিক বোঝে না। তার এই সেবারত, নিরন্তর কর্মরত শান্ত সহ্যশীলা স্নেহময়ী মেয়েটিকে খুব ভালো লাগে, সে এলে মনে হয় বুকের রক্ত অজানা আনন্দে—হয়ত বা কি একটা অজ্ঞাত আশায় ছলাৎ করে ওঠে—কিন্তু আজকের এ অনুভূতি অন্যরকম, অন্য কিছু। মনে হয় সমস্ত দেহে আগুন জ্বলছে, সে একটা কিছু অঘটন না ঘটিয়ে থাকতে পারবে না—

সে সবলে টেনে নেয় সরস্বতীকে। সরস্বতী প্রস্তুত ছিল না, নিজেকে সামলাতে পারল না, বাধা দিতেও না, একেবারে মাতাপ্রসাদের বুকের ওপর এসে পড়ল। মাতাপ্রসাদ সবলে সবেগে জড়িয়ে ধরল ওকে, কোনো জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা ছিল না, তবু প্রকৃতি বা দেহ তার কাজ করে গেল, সে সরস্বতীর ঠোঁট দুটোর ওপর নিজের ঠোঁট চেপে ধরে যেন ঘষতে লাগল।

বাধা দেবার সুযোগ ছিল না, কিন্তু ইচ্ছাই কি ছিল?

না, তাও ছিল না।

বরং যেন এই ক'মাস ধরে এই মুহূর্তটিরই প্রতীক্ষা করছিল। সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণই করতে চায় যে—সে তো করবেই। তবু করা হলো না। করা গেল না।

মাতাপ্রসাদের অভিজ্ঞতা নেই, সরস্বতীর আছে। স্বামীর দেহের গোপনতম অংশের আকৃতি ও প্রকৃতি স্ত্রীর অজানা থাকবে কেন।

লোভ প্রবল। এর চেয়ে বেশী লোভ—আসক্তি কামনা যে নামই দাও, লোভই—মানুষের জানা নেই। বিচার বিবেচনা বুদ্ধি হিতাহিত জ্ঞান, ভবিষ্যতের চিন্তা নিমেষে ভাসিয়ে দেয়, শিক্ষা সংস্কারও।

কিন্তু ঐতিহ্য বুঝি আরও বড় জিনিস। সে এমন একটা সংস্কার যা মানুষের ইষ্টবুদ্ধির থেকেও বলবান।

সরস্বতী পণ্ডিত বংশের গুরুবংশের মেয়ে, পণ্ডিত বংশের বধূ। বহুশত বৎসরের সতীত্ববোধের সংস্কার তার রক্তে।

শেষ মুহূর্তে একটা প্রবল আঘাতে যেন তার সংবিৎ ফিরল। এই বহু ঈপ্সিত, কাম্য, এতদিনের স্বপ্ন দেখা মুহূর্তটির মোহ ভেঙে গেল সে আঘাতে। কোনো মতে স্নায়ুকে শাসন করে পেশীতে বল ফিরিয়ে আনল সে, সকলের থেকে লোভনীয় সেই চরম আলিঙ্গন থেকে মুক্ত করল নিজেকে। চাপা আর্তস্বরে বলে উঠল, 'না না, এ তো তুমি নয়। তুমি নয়। এ ক বছরে এত পরিবর্তন কি করে হবে। আর সমস্ত তো—। ওগো বলো বলো, একটা অন্তত আগের কথা বলো! প্রমাণ করে দাও সেই তুমি।'

জীবনে এই প্রথম—জ্ঞানে তো প্রথম বটেই—এতখানি আবেগ অনুভব করেছে মাতা প্রসাদ—তার ব্যর্থতায়, সরস্বতীর এই শেষ মুহূর্তের প্রত্যাখ্যান—তার এখনও দুবল শরীর যেন অবশ হয়ে এলিয়ে পড়ল। সে কথা বলতে পারল না। ক্লান্ত, কিছুটা বিরক্ত হয়ে চোখ বুজে অ-ব্যয়িত আবেগের আঘাত সামলাবার চেষ্টা করতে লাগল। এও এক অভিনব, অননুভূত অভিজ্ঞতা।

সময় লাগল বৈকি সরস্বতীর, শিথিল দেহটাকে, অবশ পেশীগুলোকেও উন্মত্ত কামনাতে সঞ্জীবিত, সংযত ও সংহত করে উঠে দাঁড়াতে। মশারির দড়িও আবার টাঙানো হলো।

তবে তখনই আর কিছু করতে পারল না। দাওয়ার ওপরই শুয়ে পড়ল। বুকের মধ্যে তখন কী একটা কষ্ট হচ্ছে, মনে হচ্ছে সমস্ত রক্ত মাথায় উঠে গেছে, মাথাটা এখনই ফেটে যাবে।

রান্নাঘরে কাজ পড়ে। গোয়ালের কাজ সেরে চলে যাবার সময় লোকটি ডেকে দিয়ে গেল, 'ভাবীজী উঠে দরজা বন্ধ করুন'। ওর তখনও খাওয়া হয় নি—কিন্তু কিছুই করতে পারল না। এই প্রথম ওর মানসিক বিপর্যয়—মানসিক বলাও ভুল, আসলে উগ্র বহুদিনের নিরুদ্ধ দৈহিক জৈবিক কামনার বিপুল স্রোতকে বাধা দিতে গিয়ে—কর্তব্যে ত্রুটি ঘটল।

বহুরাত্রে যমুনা অন্য সন্দেহ করে বেরিয়ে এসে ওকে ঐভাবে পড়ে থাকতে দেখে ঘুমিয়ে পড়েছে মনে করে ডাকাডাকি করে তুলল। শরীর খারাপের ভান করল সরস্বতী, তবে সেই অজুহাতেই আর কিছু খেল না। বাসনগুলো গোছ করে শোবার ঘরে এনে রান্নাঘরে তালা লাগিয়ে শুয়ে পড়ল। অসহ্য মাথার যন্ত্রণা হচ্ছে, এই কারণেই ঘুম হচ্ছে না, হবেও না হয়ত—যমুনাকে শুনিয়ে রাখল।

আর দেরি করা উচিত নয়। এমনিই এ নাটক বহুদূর এগিয়ে গেছে। শাশুড়ির জন্যেই এতটা এগিয়েছে। কিন্তু এবার যাহোক একটা কিছু হওয়া দরকার। বিশেষ যমুনার মনোভাব ভালো না, বন্যার মতোই দুর্বার। সরস্বতী মনস্থির করে ফেলে।

চঞ্চল অস্থির হয়ে উঠেছেন মাতাপ্রসাদও। সে-রাত্রের ঘটনা ওকে কিছুটা বিহ্বল করেও তুলেছে। এ কামনাও ওর কাছে অপরিচিত। এর কারণ, এর নাম—কিছুই জানেন না তিনি। তাও যেমন বুঝতে পারছেন না, সরস্বতীর আচরণও নয়। যে বলতে গেলে নিজেই এসে ধরা দিল সে এমন করে যেন বিষের মতো ওঁকে—ওঁর আলিঙ্গনকে পরিহার করে চলে গেল কেন?

বুঝতে পারেন না কিন্তু দৈহিক যন্ত্রণা, অস্থিরতা বুঝতে পারেন। বুঝতে পারেন যে কোনো নারীকে চাই তাঁর। তিনি যেন কিছুটা রুক্ষ হয়ে ওঠেন। কথাবার্তায় অকস্মাৎ উষ্মা প্রকাশ পায়।

সেটাও সরস্বতীর চোখ এড়াল না। একদিনে শান্ত ভদ্র মানুষটা এমন হয়ে উঠল কেন তাও বুঝতে বাকী রইল না। নিজেকে দিয়েই বুঝছে ওঁর অবস্থা।

সে সন্ধ্যার দিকে শাশুড়ির পায়ে তেল মাখাতে গিয়ে বললো, 'মা, আর দেরি করা উচিত হচ্ছে না কিন্তু। অনেক দূর এগিয়ে যাচ্ছে জিনিসটা। এরপর বহু কথা উঠবে। সমাজে এ নিয়ে ঘোঁট হবে।'

শাশুড়ি ব্যস্ত হয়ে ওঠেন, 'কী মা, কিসের কথা?

আজও লজ্জার সীমা থাকে না শাশুড়িকে কথাটা বলতে। তবু আজ তাকে বলতেই হবে। সে গলা আরও নামিয়ে বললো, 'আপনি ওঁকে ছেলে বলেছেন, সেটার তো প্রমাণ কিছু নেই। এধারে আমি ওঁর সেবা করছি, রাত্রেও ঘরে যেতে হয় নানা কাজে। কথা তো উঠতেই পারে মা। অথচ এদিকে যমুনা ওঁর জন্যে পাগল হয়ে উঠেছে, সেটাও আপনার লক্ষ্য করা উচিত।'

'সে কি। কী বলছ সরস্বতী বেটী! নিজের বোন! না না, ভুল বলছ!'

'বোন তো আপনি বলছেন। সে কেন বুঝবে। সে যুবতী হয়ে উঠেছে— ঘরের মধ্যে একটা পুরুষ, তার মন তো চঞ্চল হয়ে উঠতেই পারে। যা করবার একটা হেস্ত-নেস্ত করুন। বড্ড দেরি হয়ে গেছে এমনিতেই।'

শাশুড়ি উত্তর দেবার আগেই সরস্বতী আরও বলে, 'মা, আপনি ওঁকে যে নামে ডাকেন সে তো আপনার ছেলের নাম নয়। যমুনা বলে, যদি সত্যিই উনি বিশ্বাস করেন তো আসল নামে ডাকেন না কেন?'

শাশুড়ি পাথর হয়ে বসে থাকেন। তিনি অন্ধ হয়ে আছেন ঠিকই, অথবা চোখকে জোর করে বুজিয়ে রেখেছেন।

অনেকক্ষণ পরে আস্তে আস্তে বলেন, 'তাহলে ওঁকে বলি, পুরোহিত ডেকে নারায়ণের পূজা হোম করে ওর গলায় জেনেউ দিই—আর ক'জন ব্রাহ্মণকে ডেকে তাঁদের অনুমতি নিয়ে তোমাকে ওর ঘরে নেবার ব্যবস্থা করি।'

যেন শিউরে ওঠে একবার সরস্বতী।

সে কি লজ্জা, না নিরুদ্ধ আবেগ, পূর্বরাত্রের স্মৃতি, না নিজের ভবিষ্যৎ

নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, সেই কারণে তার জন্যই আকুলতা।

তবু মনে জোর আনে সে।

বলতেই হবে তাকে। আর সঙ্কোচকে প্রাধান্য দিলে চলবে না।

বলে 'মা, তার আগে আপনি নিঃসন্দেহ হোন। এ ধর্মের ব্যাপার, বংশের মর্যাদা নির্ভর করছে এর ওপর। এরপর যদি অন্যরকম হয়—যদি ইনি না হন, আসল লোক আসেন—তখন আমার কি হবে, আমার যদি আবার ছেলেমেয়ে হয়, তাদের কি হবে ?'

এমনভাবে ভাবেন নি রঘুবরের মা-ও। পুত্রস্নেহে অন্ধ, উন্মত্ত হয়ে উঠেছিলেন, এসব ছোটখাটো তথ্য নিয়ে চিন্তা করার অবকাশ পান নি। ব্যাকুলভাবে বলেন, 'কিন্তু প্রমাণ—প্রমাণ কি করে পাবো মা। ও যদি আগের একটাও কথা বলতে পারত—। আমার তো কিছু মাথায় আসছে না। উনিও তো কত ভেবেছেন।'

'আমি বলতে পারি মা, একটা চিহ্নর কথা। আমাকে নির্লজ্জ ভাববেন না, অপরাধ নেবেন না। ধর্মের প্রশ্ন জাতের প্রশ্ন বলেই বলতে বাধ্য হচ্ছি।' সে মাথাটা আরও নামিয়ে হেঁট করে কণ্ঠস্বর আরও নামিয়ে বলে। তবু অন্ধকার বলেই সম্ভব হলো, আর সে অন্ধকার সৌভাগ্যক্রমে নয়। ইচ্ছা করেই প্রদীপের আলো আড়াল করে এসে বলেছিল সে।

নির্বাক হয়ে গেলেন শাশুড়ি। বুকের মধ্যেটা একটা অজানা আশঙ্কায় ঢিপ ঢিপ করতে লাগল।

কেন এমন একটা অভ্রান্ত চিহ্নর কথা বললো বৌটা, যদি এখন না মেলে, যদি ছেলেটা পরই প্রতিপন্ন হয়—তিনি আবার সন্তানহারা হবেন। আর এতদিনের এই আত্মীয়বৎ আচরণেরই বা কি কৈফিয়ৎ দেবেন লোকের কাছে ! যা তা বলবে যে সকলে।

অনেকক্ষণ পরে আস্তে আস্তে বলেন, 'কিন্তু বয়সের সঙ্গে অনেক ওসব তিল জড়ুল তো মিলিয়েও যায় শুনেছি।'

'তিল বা জড়ুল কি মিলোয় ! বয়স হলে তিল বরং আরও দেখা দেয় শুনেছি !'

তবু শাশুড়ি ভেবে চিন্তে কি একটা বলতে যাচ্ছিলেন, সরস্বতী বললো,

'আপনার ধর্মের ঘর মা, শুনেছি তিনশো বছরের গৃহদেবতা আপনার ঘরে।'

আর কিছু বলতে পারল না। নিজের একটা শান্তির জন্য, কৃত্রিম বিশ্বাসকে পুষ্ট করা—মিথ্যাকে আঁকড়ে ধরা সত্যর দিকে চোখ বুজে থেকে —তাঁরও শিক্ষা-সংস্কারে বাধে।

তিনি অবশেষে যেন হাঁকড় পাঁকড় করে শেষ অবলম্বন একটা ধরতে যান, 'কিন্তু ওখানে কে দেখবে মা। যতই হোক ছেলে বড় হয়েছে—'

'ওঁকেই জিজ্ঞাসা করুন না মা। উনি নিজেই তো দেখতে পারেন। না হয় বাবুজীকে বলুন, তিনি তো অনায়াসেই দেখতে পারেন। পুরুষ মানুষ, বাপের মতো কিংবা বাপই—লজ্জার আর কি আছে!'

আর কিছু বলার উপায় থাকে না।

শাশুড়ি তখনকার মতো নিঃশব্দে শুয়েপড়েন। হতাশা, বিপুল হতাশা। তাঁর মনের মধ্যে কেমন করে যেন নিজেই বুঝতে পারছেন যে এরকম প্রত্যক্ষ প্রমাণে তাঁর মামলা টিকবে না। দুই চোখ দিয়ে জল ঝরতে থাকে সম্ভবত, সরস্বতী তা নিয়ে আর মাথা ঘামায় না।

মামলা টিকল না। রুক্‌মিনীনাথ মাতাপ্রসাদকে বলতে, তিনি বাইরে জঙ্গলের মধ্যে গিয়ে ভালো করে দেখে এলেন। না, তেমন কোনো চিহ্ন কোথাও নেই।

মাতাপ্রসাদের মা আছড়ে পড়লেন। জীবনে এই দ্বিতীয়বার পুত্রহারা হলেন তিনি। রুকমিনীনাথও তাঁকে কোনো সান্ত্বনা দিতে পারেন না; তাঁরও মনে মনে যে একটা বিপুল আশার প্রাসাদ গড়ে উঠেছিল, সেটা এতদিনে টের পেলেন।

শুধু সরস্বতীই যেন সহসা কঠিন হয়ে উঠল। ও যে কঠিন হতে পারে —শান্ত শিষ্ট নম্র নতমুখী বধূটি—এরা কেউ এতদিন ভাবতে পারেন নি। এঁরা বিহ্বল হয়ে আছেন কিন্তু সে নিজেদের দুঃখেই, নিজেদের ক্ষতির কথা ছাড়া আর কিছু ভাবছেন না, এমন কি বর্তমান অবস্থাটাও ভাববার চেষ্টা করেছেন না। ক্ষতি যে এই বধূটিরই সব চেয়ে বেশী হলো—সে

কথা মনেও পড়ছে না তাঁদের।

সরস্বতী সব লজ্জা ত্যাগ করে শ্বশুরের সামনে এসে দাঁড়াল। ঘোমটা অনেকটা তুলেই আজ বলল, 'বাবুজী, ভাবনাসে কর্তব্য উঁচা হ্যায়—ইয়ে আপহি কে মুহ্ সে শুনা। আব কেয়া করনা এহি শোচিয়ে। উহ্ সজ্জন আব কাঁহা জায়গা, আপলোক কেয়া বোলেঙ্গে ইয়ে তো ঠিক কর লিজিয়ে।…এ্যয় সে হি বহোৎ দের হো গিয়া!'

রুক্মিনীনাথ সচকিত হয়ে ওঠেন বৈকি।

কি করবেন ভেবেও তো পান না।

এতকাল যাকে পুত্রস্নেহে পালন করেছেন, শুশ্রূষা করেছেন, বলতে গেলে নবজন্ম দিয়েছেন, তাকে এক কথায় কি করে বলেন, 'তুমি চলে যাও! যেখানে খুশি, যেমন করে খুশি অন্নসংস্থান করো তোমার।' এদেরই বা কি বলবেন, 'পড়োশী'-দের। ছেলে নয় প্রত্যক্ষ প্রমাণ পেয়েছেন একথা বলার পরই প্রশ্ন উঠবে, ব্রাহ্মণের ঘরে এ কী অনাচার। কী জাতের লোক ঠিক নেই, ঘরের মেয়ে বৌ তার সেবা শুশ্রূষা করেছে, যদি জাতে ঠেলার প্রশ্ন ওঠে।

সেই কথাই শেষে বলেন, উপযুক্ত বুঝে পুত্রবধূকেই বলেন, কি করবেন পরামর্শ চান।

সরস্বতী বলে, 'প্রমাণ পেয়েছেন সে কথা বলবার দরকার কি বাবুজী। বরং কোনোদিকেই প্রমাণ কিছু পান নি, ওঁর নষ্ট স্মৃতি ফিরে না এলে পাওয়া যাবেও না, এক্ষেত্রে একেবারে নিশ্চিত ওঁকে পরিবারের মধ্যে নিতে পাচ্ছেন না—এই কথা বলাই তো ভালো বরং ওঁর একটা কিছু জীবিকার ব্যবস্থা করে দিন, আপনার তো এখনও কিছু শেঠ শিষ্য আছে—তারা অনায়াসে করে দেবে। চাই কি বিয়ে থা করে উনি সংসার পাততে পারবেন। মা গিয়ে সেখানে থাকতে পারবেন মধ্যে মধ্যে।'

'বিয়ে কে দেবে মা, কি জাত তাইতো জানলাম না।'

'ওঁর ভাবভঙ্গী দেখে মনে হয় উনি ব্রাহ্মণের ঘরের ছেলেই ছিলেন। আমি দেখেছি ভোরে উঠে উনি জপের ভঙ্গিতে হাত তোলেন, স্নান করে উঠেও তাই—কিন্তু মন্ত্র মনে পড়ে না বলেই বোধহয় হাল ছেড়ে

দেন, কেমন যেন দুঃখিত বোধ করেন মনে মনে।'

তারপর একটু থেমে বলে, 'আপনি বরং সেই অজুহাতে একটা অনুষ্ঠান করে জেনেউ পরিয়ে দিন না। চাই কি তা'হলে তা'হলে—'

একটু ইতস্তত করে দ্বিধা-জড়িত কণ্ঠে বলে ফেলে, 'যমুনা ওঁকে ভালবেসে ফেলেছে বাবা। ওর সঙ্গেই কেন বিয়ে দিয়ে দিন না।'

'যমুনা ওকে ভালবাসবে কি। বয়সের অত তফাৎ' ভদ্রলোক ব্যস্ত হয়ে ওঠেন, 'তাছাড়া ওতো ভাই বলেই জেনেছে, এরকম ভাব মনে আসবেই বা কেন, একি অনাচার আমার ঘরে। ছি ছি!'

অপ্রসন্ন কণ্ঠে বলেন রুক্‌মিনীনাথ।

'ও ভাই বলে কখনই বিশ্বাস করে নি। বরং আপনাদের বাড়াবাড়ি নিয়ে ঠাট্টা করেছে আড়ালে। আর বয়সের তফাৎ, এ আমাদের নতুন আর কি বলুন।···যাকে ছেলে বলে ভাবছিলেন তাকে জামাই করলে ঘরে রাখতে পারবেন।'

এ এমনই একটা অবিশ্বাস্য সংবাদ—এমন অভাবনীয় প্রস্তাব যে কিছুক্ষণ হতভম্বের মতো বসে থাকেন শুধু রুক্‌মিনীনাথ বধূর মুখের দিকে চেয়ে। তারপর ধীরে ধীরে বুদ্ধিবৃত্তিগুলো যেন সক্রিয় হয়ে ওঠে। বলেন, 'মা, কিন্তু ওর সঙ্গে যমুনার বিয়ে দিলেই তো সকলে বুঝবে যে আমরা নিঃসন্দেহ হয়েছি ও আমাদের ছেলে নয়, তখনই তো ব্রাহ্মণ কিনা সে প্রশ্ন উঠবে। তখন কি জবাব দেব? আমাদের বংশের মেয়ে তুলে দেব বেজাত কি অজাতের ছেলের হাতে!'

এবার সরস্বতীকেও চুপ করে যেত হলো।

অনাত্মীয় এঁরা—এটা নিশ্চিত জানার পর মাতাপ্রসাদও ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। তাঁর পূর্ব জীবনের স্মৃতি না থাক, এই গত ক' মাসের অভিজ্ঞতায় বহুলোকের কথাবার্তায় আলাপ-আলোচনায় মোটামুটি সামাজিক কাঠামোটা বুঝতে পেরেছেন, তার জাত গোত্রের ঠিক নেই। এ অবস্থায় গুরু বা পণ্ডিতের বাড়ি পুত্রবৎ প্রশ্রয়ে বাস করা, বিশেষ অন্তঃপুরিকাদের সেবা নেওয়া এঁদের পক্ষে ক্ষতিকর, ভবিষ্যতে অনেক জটিলতার সৃষ্টি হতে পারে। অনেক করেছেন এঁরা, এবার এঁদের অব্যাহতি দেওয়াই

উচিত।

সেই কথাই রুক্মিনীনাথকে গিয়ে বলেন, 'এবার আমায় ছেড়ে দিন বাবুজী, যেখানে হোক গিয়ে একটা জীবিকার ব্যবস্থা দেখি—।'

'না না, সে কি করে হবে,' রুক্মিনীনাথ বলে ওঠেন, 'এমন করে তোমাকে ভাসিয়ে দিতে পারব না। দেখছি, আমি একটা ব্যবস্থা দেখছি। তুমি আর কটা দিন ধৈর্য ধরে থাকো। আর বাবা, তুমি যে আমাদের ছেলে নও, এটা কাউকে বলো না। তাতে আমাদের ক্ষতি হতে পারে। কিছুই যখন ঠিক বোঝা যাচ্ছে না—এই মিথ্যেটাই সত্যি হয়ে থাক!'

ব্যবস্থা একটা হয়েও যায়।

রুক্মিনীনাথের এক শিষ্য লক্ষ্ণৌ থেকে কিছু দূরে এক বিরাট গোশালা করেছিলেন বছর কতক আগে, তার সঙ্গে কিছু ফল ও আনাজের চাষ। তিনি অন্য ব্যবসায় ব্যস্ত থাকায় ওদিকে নজর রাখতে পারেন নি, কিছুদিন ধরেই লোকসান খাচ্ছে। কিষেণ আর গোয়ালারাই লুটে খাচ্ছে সব। উনি সেই সমস্ত জমি সাজপাট সুদ্ধ গুরুজীর পুত্রস্থানীয়কে ছেড়ে দিলেন, নামমাত্র খাজনায় ত্রিশ বছরের লীজ সাব্যস্ত করে একেবারে দলিল করে দিলেন। আর প্রথম দিকে নগদ খরচ কিছু যা করতে হবে সে বাবদও হাজার দুই টাকা দিলেন। ওতেও হবে না বুঝে রুক্মিনীনাথ নিজেও আর হাজার দুই টাকা যোগাড় করে দিলেন। মাতাপ্রসাদ এসব কিছুই জানে না, সেজন্যে নাজিবাবাদ থেকে একটি বৃদ্ধ অভিজ্ঞ লোককে সঙ্গে দিলেন—সে মাসছয়েক থেকে মাতাপ্রসাদকে সব বুঝিয়ে দিয়ে আসবে।

বহু কান্নাকটি করলেন যমুনার মা, রুক্মিনীর চক্ষুও শুষ্ক রইল না। তবু তার মধ্যেই যাত্রার গোছগাছ করতে হলো। বিছানা চাই কিছু, জামা-কাপড়—আর 'গিরস্থী'র জিনিস যা যা দরকার। গুছিয়ে দিল সরস্বতীই। সে যেন কেমন যন্ত্রের মতো হয়ে গেছে—মুখ ভাবলেশহীন, হাসিও নেই, কোনো দুঃখও প্রকাশ পায় না, অথচ কর্তব্যেও ত্রুটি নেই। ঠিক কর্তব্যও হয়ত নয়—কারণ এত ভেবে ভেবে জিনিস গুছিয়ে দেওয়া, কি কি লাগা সম্ভব মনে করে, এমন যত্ন করে সাজিয়ে বেঁধে দেওয়া

—শুষ্ক কর্তব্যে হয় না, তার সঙ্গে ইচ্ছুক ও উৎসুক মনের যোগ চাই। মাতাপ্রসাদও তা লক্ষ্য করেন, এই গত ক'মাসে উনি অনেক বুঝেছেন, স্নেহ ভালবাসার আস্বাদ পেয়ে কোন্‌টা যথার্থ আর কোন্‌টা অভিনয় তা বুঝতে শিখেছেন।

তাঁর সেদিনের নবজাগ্রত অতৃপ্ত জৈবিক ক্ষুধা—যা ঠিক কি এখনও বুঝতে শেখেন নি, অথচ যা সেদিন থেকে অবিরাম পীড়ন করছে—সে পীড়ন যে কি আর কেন, তাও জানেন না—সেইটিই তাঁর মনকে এক দুর্বার আকর্ষণে টানছে এই মেয়েটির দিকে, ওকে এক নূতন আলোকে নূতন মহিমায় দেখতে শুরু করেছেন।

কৃতজ্ঞতার অন্ত নেই, সেই কৃতজ্ঞতা বুঝি প্রেমে রূপান্তরিত হয়েছে। হয়ত একে ঘিরে একটা আশাও রচিত হয়েছিল মনে মনে, এঁদের সকলের ইচ্ছা-কল্পনায় মেশা কথাবার্তা থেকে সত্যিই একে নিজের একটি অবলম্বন বলে ভাবতে শিখেছিলেন। এখন সে আশা ভঙ্গ হওয়াতে ওকেই পাবার ইচ্ছা মনে মনে প্রবল হয়েছে। সেটাও কি, পূর্ব অভিজ্ঞতা না থাকায় তার স্বরূপে দেখতে পাচ্ছেন না, শুধু একে ফেলে চলে যেতে হবে চিরদিনের মতো ভাবতেই মনটা টনটন করে উঠছে—এঁদের এই আয়োজন, দূর বিদেশে নূতন বৃত্তি নূতন জীবিকায় প্রতিষ্ঠিত করার ব্যস্ততা অরুচিকর বোধ হচ্ছে—সমস্ত জীবনটা সম্বন্ধেই একটা বিতৃষ্ণা আসছে।

এ ওঁর কী জীবন। ওঁকে নিয়ে বিধাতার এ কি খেলা।

বিধাতার আরও কিছু খেলা বাকী ছিল, সেটা প্রমাণিত হলো এই যাত্রার দুদিন আগে।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেছে সে সময়টায়।

বাড়িতে কেউ বিশেষ নেই, যমুনার মা গেছেন কিছু দূরে এক বান্ধবীর বাড়ি, তাঁদের তিন জা-ই অসুস্থ, কে কার মুখে জল দেয় তার ঠিক নেই। তিনি গেছেন, তাদের কিছু শুশ্রূষা ও পথ্য এবং ছেলে-মেয়েদের খাওয়ার ব্যাবস্থা করতে। যমুনা তাঁর সঙ্গে গেছে। রুক্মিনীপ্রসাদ

স্থানীয় মন্দিরে পাঠ শুনতে যান প্রত্যহ, পাঠ শেষ হলে আলোচনা থাকে, তাঁর ফিরতে দেরি হয়। ভৃত্য দু'জন বাগানের কাজ ও গোরুর কাজ শেষ করে এই সময় একটু এদিক ওদিক যায়। এই সময়টাই তাদের ছুটি।

সরস্বতী সন্ধ্যা দিয়ে ঠাকুর ঘরে প্রণাম করে রসুই করতে যাবে, হঠাৎ তার মনে হলো – মাতাপ্রসাদ কোথায়? এদিক ওদিক চেয়ে দেখল তিনি তাঁর ছোট ঘরটাতে শুয়ে আছেন।

এমন অসময়ে শুয়েছে কেন! তবে কি শরীর খারাপ হলো? সে দ্রুত এঘরে এলো। বোধ হলো তার আশঙ্কাই সত্য, কেন না চোখবুজেই শুয়ে আছে।

আন্তরিক বা আত্যন্তিক আশঙ্কা নিমেষে সঙ্কোচের প্রাচীর ভেঙ্গে দেয়। সে একেবারে এসে খাটিয়ার কাঠটার ওপর বসে পড়ে কপালে, গলায় হাত দিয়ে একটু কাঁপা কাঁপা গলায় প্রশ্ন করে—'এমনভাবে এসময় শুয়ে আছ যে, শরীর খারাপ লাগছে?'

চোখ খুললেন মাতাপ্রসাদ। একটু যেন ক্লিষ্টকণ্ঠে উত্তর দিলেন, 'শরীর খারাপ লাগলেই বা কী করা যাবে বলো, যেতে তো হবেই। একা নির্বান্ধব জায়গায় একাই থাকতে হবে।'

কি যেন একটা গলার কাছে ঠেলে উঠছে সরস্বতীর।

এটা কি, কান্না, অভিমান, বেদনা।

অভিমান কার ওপর? অদৃষ্ট, সমাজ, সংসার—না নিজের ওপরই?

অনেকক্ষণ পর বলে, 'তুমিই তো যেতে চেয়েছিলে?'

'এখানে কি করে থাকব বলো। কি পরিচয়ে? সেইজন্যেই তো যেতে চেয়েছিলুম। যেতে হবেও।···থাকতেও ইচ্ছে করছে না, যেতেও ইচ্ছে করছে না, এ এক অদ্ভুত অবস্থা হলো।'

'যেতে ইচ্ছে করছে না কেন?' হঠাৎ কেন সরস্বতীর গলা তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে, 'যমুনার জন্যে?'

'না, তোমার জন্যে। তোমার মতো এমন কাউকে আর দেখিনি।' শান্ত সহজভাবে বলেন মাতাপ্রসাদ 'তোমাকে ছেড়ে গিয়ে কি করে থাকব

—সেইটেই ভাবছি তখন থেকে।'

'কেন, যমুনার বয়স অল্প, দেখতেও বেশ সুশ্রী, সে—সে তোমাকে ভালবাসে।'

'তা জানি না। ওসব বুঝি না। কিছুই বুঝতে পারি না। শুধু মনে হয়, তোমার মতো কেউ নেই, তুমি আশ্চর্য!'

অকস্মাৎ কোথা দিয়ে কি হয়ে যায়।

সরস্বতী নিবিড়ভাবে ওকে জড়িয়ে ধরে, গালের ওপর গাল রেখে বলে, 'আমিও—আমিও তোমাকে ছেড়ে থাকতে পারব না, তোমাকে ছেড়ে বাঁচব না। তুমিই আমার সেই, সেই!'

আবারও দেহের মধ্যে একটা উত্তেজনা, একটা পরিবর্তন বোধহয় মাতাপ্রসাদের।

সেদিন আর তিনি তা ব্যর্থ হতে দেন না।

ব্যর্থ হতে দেয় না সরস্বতীও।

নতুন জায়গায় গিয়ে নতুন কাজ নতুন পরিবেশ বুঝে নিতে দেরি হয়। চাষ আবাদ, সব্‌জি গরু বাছুর—কিছুই জানত না, তবু কেমন যেন ছায়ার মতো আবছা আবছা একটা মনে হয়—এসব তার অজানা নয়। এই কাজই করতে হবে, এই তাঁর জীবিকা।

জোর করে মন দেবার চেষ্টা করেন। কাজ করেনও। কিন্তু কাজের পিছনে যে মনটা সক্রিয় থাকা দরকার সে মনটাকেই যেন খুঁজে পাওয়া যায় না। সে মন পড়ে আছে নাজিবাবাদের সেই একটি ছোট বাড়ির এক পাশে ছোট্ট একটি ঘরে, যেখানে এক কর্মরতা সেবাময়ী নারী সন্ধ্যা দেখাচ্ছে, রান্না করছে, সস্নেহে সযত্নে খেতে দিচ্ছে, কারও মুখ শুষ্ক দেখলে উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠছে।

তবু মোটামুটি কাজকর্ম খানিকটা শিখে নিয়ে একরকম করে চালাচ্ছিলেন, চালাতে হবে বলেই বোধহয়। কিন্তু ভালো লাগছিল না একটুও।

সে কি সেই মেয়েটির জন্যেই? তাকেই কি মাঝে মাঝে অন্যমনস্কভাবে

দিগন্তের দিকে চেয়ে খোঁজেন, রাত্রে শুয়ে আকাশের দিকে চেয়ে ?

মাস তিনেক পরে সহসাই একদিন প্রায় শেষরাত্রে একটি বয়েল গাড়ির শব্দ উঠল। হয়ত পাশের গ্রামে কেউ যাচ্ছে, কোন বৌ-ঝি। কিন্তু এমন সময়ে কেন ? এ-সব পাড়াগাঁ অঞ্চলে সন্ধ্যের পর কোনো মেয়ে-ছেলে কেউ পথে বেরোয় না দূর পাল্লায়। যাত্রা দূর পথের না হলে বয়েল গাড়িই বা কেন ? আর শব্দটা যেন এদিকেই আসছে না ?

বাইবেই শুয়েছিলেন মাতাপ্রসাদ। তাড়াতাড়ি উঠে বসলেন। দেখলেন গাড়ির মুখ এদিকেই।

গাড়ি থামল একটু দূরেই। তার একমাত্র আরোহিনী একটি ছোট্ট পুঁটুলি নিয়ে প্রায় ছুটতে ছুটতে এসে তাঁর পায়ের কাছে আছড়ে পড়ল।

সরস্বতী !

সত্যিই সরস্বতী। না তিনি স্বপ্ন দেখছেন ?

দেখা গেল স্বপ্ন না, সত্য।

'তুমি, তুমি এমনভাবে একা ? কার সঙ্গে এলে ? ওখানের খবর কি ?'

কেঁদে ফেলল সরস্বতী, 'ওখানে আর আমার ঠাঁই নেই। আমার আজ কেউ নেই। আমি পালিয়ে এসেছি। আমার, আমার ছেলে হবে। তোমার ছেলে।...অনেক ভেবেছি, অনেক কেঁদেছি। মরতেই যাচ্ছিলুম। যমুনাই এখানে পাঠাল। একমাত্র সে-ই জানে। কীভাবে আসতে হবে সে-ই বলে দিয়েছে। একটা লোককেও পেয়ে গেলুম, এক বুড়ো মানুষ —তিনি উত্‌রাইতিয়ায় নেমে, আমাকে এই বয়েল গাড়ি ঠিক করে দিলেন। বললেন, এ গাড়িবান আমার চেনা, বিশ্বাসী লোক। তোমার কোনো ভয় নেই, চলে যেও।'

গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে উঠেছে মাতাপ্রসাদের। কোনোমতে বললেন, 'আমার ছেলে। মানে সেদিনের সেই ব্যাপার !...তুমি ঠিক জানো ? এমনিই হয় নাকি ?

সরস্বতী হাসল শুধু একটু, কান্নার মধ্যেও।

'কিন্তু, কিন্তু এখানে থাকবে—এরা কি মনে করবে ? আর ওঁর—বাবুজীরাও কি কোনো খবর পাবেন না।'

'না না, এখানে থাকা সম্ভব নয়। জানাজানি হবেই। অমি আমার সব জেবর নিয়ে এসেছি। যমুনাই গুছিয়ে দিয়েছে। কিছু টাকাও। চলো আমরা আজই বনারস চলে যাই। বনারস আমি গিয়েছি। সেখানে বহু লোক—কেউ কাউকে চিনবে না। এইসব গহনা বেচে সেখানে একটা কিছু দোকান দেবো আমরা। আমাদের দু'জনের মতো বেশ চলবে। না হয় আমি কিছু চাকরি-বাকরি খুঁজে নেবো। আজই চলো।'

'কি জানি। আমি কিছু যেন ভাবতেও পারছি না। যা হয় তুমিই করো।' অবসন্নভাবে উত্তর দেন মাতাপ্রসাদ।

তারপর তিন-চারটে বছর কাটে মাতাপ্রসাদের যেন দুঃস্বপ্নের মধ্যে দিয়ে। বাচ্ছাটা জন্মাল চিররুগ্ন। অনেক কাণ্ড করে ওরা যদিবা একটা দোকান দিল, সে দোকান চললো না। মহাজন বাজে মাল দিয়ে ঠকাল, খদ্দেররা ধার নিয়ে কেউ শোধ দিল না। তাছাড়া কোন্ জিনিসের কি কদর, কার চাহিদা হবে—সরস্বতীর যদিবা কোনো জ্ঞান থাকে, মাতাপ্রসাদের কিছুই নেই। কতক জিনিস পড়ে নষ্ট হলো—টাকার অভাবে চালু মাল আনা গেল না। অগত্যা দোকান তুলে দিতে হলো।

সরস্বতী কাজ করতে চায়। ছেলেটাকে দেখে কে! আর কি কাজই বা করবে। দু-একটা ঠাকুর বাড়ি রান্নার কাজ খুঁজল কিন্তু কেউই ভরসা করে দিল না। এভাবে অনেক মানুষ হঠাৎ জোড়ে এসে কাশীতে আশ্রয় নেয় —এভাবে বাস করতে এলেই লোকে অবিবাহিত ধরে নেয়।

মাতাপ্রসাদ সব্জী বিক্রীর কাজ শুরু করল দশাশ্বমেধের রাস্তায়। তাতে পরিশ্রম যত পয়সা তত নয়। হাতের পুঁজি ফুরিয়ে এলো ক্রমে, অন্ন-সংস্থান দায় হয়ে উঠল।

এরই মধ্যে একদিন এক দণ্ডী মাতাপ্রসাদকে দেখে সম্ভাষণ করলেন, 'আরে, তুমি কালিকানন্দ না?' মাতাপ্রসাদ ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে আছে দেখে বললেন, 'না না, ভুল হয়ে গেছে। নারায়ণ, নারায়ণ!'

এদিকে দুর্গতির চরম, তার ওপর ক্রমেই মাতাপ্রসাদের মনের মধ্যে অপরাধবোধটা ভারী বোঝার মতো হয়ে উঠছে। রুক্মিনীনাথের সেই

স্নেহ, বলতে গেলে তিনি নবজন্ম দান করলেন ওকে, যমুনার মার অকৃত্রিম পুত্রস্নেহ—তার কী চমৎকার শোধ দিলেন উনি। অতবড় সর্বজনমান্য লোকটা—তাঁর কুলে এই কালি পড়ল, তিনি কি এ আঘাত সহ্য করতে পেরেছেন ? হয়ত মারাই গেছেন। নিশ্চয় যমুনার মাও। তাঁর কথা মনে হলেই চোখে জল আসে।

এসব কথা আগে বুঝতেন না। এখন বোঝেন। একটু একটু করে পৃথি-বীর নিয়ম, সংসার-সমাজের রীতিনীতি সবই শিখছেন। যত শিখছেন ততই মনের ভারটা গুরু থেকে গুরুতর হচ্ছে।

ছেলেটা তিন বছরের হয়ে বলতে গেলে বিনা চিকিৎসায় মরে গেল। মাতাপ্রসাদের অত লাগল না, কিন্তু সরস্বতী পাগলের মতো হয়ে উঠল এবং—সবচেয়ে মাতাপ্রসাদের যা আশ্চর্য লাগল, সে সম্পূর্ণভাবে এই অবস্থার জন্যে মাতাপ্রসাদকেই দায়ী করতে লাগল। কী না বললো, ঠগ, প্রতারক, বিশ্বাসঘাতক। ওদের সকলের জীবন নষ্ট করে দিলে—এই অভিযোগ।

এর মধ্যে সহসা একদিন যমুনার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল দশাশ্বমেধ বাজা-রের সামনে। তার বিয়ে হয়ে গেছে, ঝলমল করছে নূতন শাড়িতে অল-ঙ্কারে। যমুনাই এগিয়ে এসে ধরল।—মাতাপ্রসাদ দেখতে পান নি—যমুনা এক দাসীর সঙ্গে বাজার করতে বেরিয়েছে।

'এ কী, তোমার এমন হাল! ভাবী কোথায় ?'

'সে ঘরে আছে। তবে ঘরও থাকবে না। বাড়িওলা ভাড়া পায় নি, বোধহয় এবার বার করে দেবে।'

সে কি: তোমরা ব্যবসা-বাণিজ্য কিছু করো নি ? চলছে কিসে ?'।

সংক্ষেপে সব বললো মাতাপ্রসাদ। যমুনাকে দেখে কে জানে কেন আরও যেন বিরক্তিতে মন বিষিয়ে উঠেছে, আকণ্ঠ তিক্ততা।

যমুনা বললো, 'চলো চলো, তোমার বাসায় চলো। আমার খুব ভালো শাদী হয়েছে, বলতে গেলে আমিই পাকড়েছি একে। এরাও ব্রাহ্মণ কিন্তু ব্যবসা করে। বোম্বেতে, কলকাতায়, এলাহাবাদে বাড়ি আছে, দিল্লীতে থাকে। এক মিনিট ফুরসুৎ নেই, আমি এই ঝি আর পূজারীকে

নিয়ে এসেছি বিশ্বনাথ দর্শন করতে, কালই চলে যাবো।'

আরও বলল সে, অনেক খবর দিল। রুক্‌মিনীনাথ আছেন, মা নেই। ও বাড়িতেও কেউ নেই আর, নাতিকে নিয়ে হরিদ্বারে চলে গেছেন বাবুজী, সেখানেই বসবাস করছেন।

তারপর একটু ইতস্তত করে বললো, 'ভাবীর যা হাল শুনছি—যদি কিছু মনে না করো তো বলি, আমাদের এলাহাবাদের বাড়ি খালি পড়ে আছে একদম। দেখাশুনোর কেউ নেই, আমার মরদ একটু জানাশুনো লোক খুঁজছে, শুধু বাড়িটা দেখাশুনো করবে—আর কিছু নয়। স্বামী স্ত্রী হলেই ভাল হয়। আমরা যাই কদাচিত, তা আমাদের সঙ্গে ঝি চাকর রান্নার লোক যায়। তোমরা শুধু খাবেদাবে থাকবে। যাবে তোমরা ? কিছু টাকাও পাবে।'

মাতাপ্রসাদ সব ভুলে নিজের বর্তমান দৈন্যদশা, এই মলিন বেশভূষার কথা সব ভুলে যমুনার হাত দুটো চেপে ধরে বললে, 'বেঁচে যাই আমি তাহলে। রোজগার আমার দ্বারা হবে না। কিন্তু তুমি আগে ওকে নিয়ে চলে যাও, একটু শান্ত হোক ওর মনটা, এখন তো আমাকে দেখলেই ক্ষেপে ওঠে। ঠিকানা দিয়ে যাও, আমি কিছুদিন পরে যাবো।'

'ঠিক যাবে তো ? না আর কোথাও ভাগবে ?'

'বেঁচে থাকলে নিশ্চয় যাবো।'

সরস্বতী প্রথমে যেতে চায় নি। যমুনার বাড়ি দাসী হয়ে থাকবে কেন, গঙ্গায় কি জল নেই। আর বাবুজী যদি কোনো দিন এসে পড়েন ?

যমুনা আশ্বাস দিল, 'আমরা দিল্লীতে আর বোম্বেতেই থাকি বেশির ভাগ, সেখানেই বাবুজী আসেন না—ওখানে আসবেন কেন ? আর বাবুজী চলে গেলে? তোমার ছেলেকে এনে তোমার কাছে দেবো, তুমি মানুষ করত পারবে।

শেষ কথাটাতেই কাজ হলো বোধহয়। পরের দিন সরস্বতী যমুনার সঙ্গে চলে গেল। যাবার আগে গাড়িভাড়ার আর একদিনের খরচা বলে জোর করে একশোটা টাকা মাতাপ্রসাদের হাতে গুঁজে দিয়ে গেল।

মাতাপ্রসাদের মন স্থির করাই ছিল। সরস্বতী চলে গেলে, বাড়ি-

ওলার বাকী ভাড়া, মুদির দোকানে দেনা ছিল, সব চুকিয়ে দিয়ে রাত্রে চৌষট্টি যোগিনীর ঘাটে চলে গেলেন। সেখান থেকে বিশ্বনাথকে প্রণাম জানিয়ে গঙ্গায় ঝাঁপিয়ে পড়লেন। আত্মহত্যা মহাপাপ? কিন্তু গঙ্গায় ডুবলে, কাশীতে মৃত্যু হলেও কি পাপ নেবেন ভগবান? আর নরক ভোগ? সে তো এ জন্মেই হয়ে গেল।

নিশ্চিন্ত মনে নিজেকে মৃত্যুর কাছে সঁপে দিলেন।

কিমাশ্চর্যমতঃপরম। এবারেও কালিকানন্দর মৃত্যু হলো না। ভাদ্রের খরস্রোতা গঙ্গা তাঁকে নিয়ে গিয়ে আছড়ে ফেলল মণিকর্ণিকার কাছে, একেবারে একটা বজরার গায়ে। দৈব এমনই, সেই বজরার সঙ্গে—আরও দু-তিনটে নৌকো বাঁধা ছিল তারই দড়িতে আটকে গেলেন।

রাত আড়াইটেয় সাধুরা স্নান করতে আসেন। তাঁদেরই একজন দেখতে পেয়ে কাছে গিয়ে দড়ির জট ছাড়িয়ে ঘাটে নিয়ে এলেন। তিনিই পরীক্ষা করে দেখলেন যে মাথায় চোট খেলেও লোকটি মরে নি। তিনিই লোকজন ডেকে হাসপাতালে পাঠিয়ে দিলেন।

এবার জ্ঞান হলো কালিকাকনন্দ রূপে। মানে পূর্ণ পূর্বস্মৃতি নিয়ে। বাল্য-জীবন, বৈরাগ্য, সন্ন্যাস, বন্যা। তারপর মাতাপ্রসাদ সরস্বতী, কাশী—গৃহস্থজীবন সব।

শিউরে উঠলেন তিনি।

রামকৃষ্ণ মিশন হাসপাতালে ছিলেন কালিকানন্দ। তাঁরা যখন প্রশ্ন করল, কোথায় থাকতেন, কী ঠিকানা, কে আছে—তখন তিনি এক সন্ন্যাসীর কাছেই আত্মপরিচয় দিলেন। বললেন, তিনিও সন্ন্যাসী, গুরুর নাম করলেন, কামরূপ মঠে তাঁর পরিচিত সাধু কেউ কেউ আছেন হয়ত। পদস্থলনের গ্লানিতেই তিনি গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়েছিলেন। এখন যদি কেউ দয়া করে তাঁকে উত্তরকাশী পাঠিয়ে দিতে পারেন তো তিনি চিরঋণী হয়ে থাকবেন।

দিয়েছিলেন তাঁরা। সেখানে এক সন্ন্যাসীর কৃপা পেয়েছিলেন। তিনি নতুন করে সন্ন্যাস দিয়েছেন। আশ্বাস দিয়েছেন স্মৃতি-ভ্রষ্ট অবস্থায় যা

করেছে তা ঈশ্বরের ইচ্ছা বলে ধরে নিতে। যদিবা কিছু অপরাধ হয়ে থাকে কঠোর তপস্যাতেই তা দূর হবে। জপ, তপ, ঐকান্তিকতা—এই যথেষ্ট।

তারপর এই শান্তি তিনি পেয়েছেন আবার, মানসিক স্থৈর্য। বেশ আছেন, বড় ভালো আছেন।

একটু হেসে বললেন, 'আগে ভাবতুম শঙ্করাচার্য গার্হস্থ্যজীবনের অভিজ্ঞতা নিয়ে এসে মাত্র এক বছরেই আবার ফিরে যেতে পারলেন কি করে ? সে জীবনে তো অনেক সুখ, অনেক ভোগ। আজ হাড়ে হাড়ে বুঝছি, তিনি পালিয়ে যেতে পথ পান নি। না বাবা, সংসারের সুখ তোমাদেরই থাক, আমি দেখছি বৈরাগ্যের পথে, সন্ন্যাসের পথেই বেশী সুখ।'

ঠাট ও বাট

খুব বেশি দিনের কথা নয়। বিষণদাস আমাদের পাড়ায় প্রথম আসে বোধহয় উনিশশো পঞ্চাশ সালে, অন্তর্হিত হয় তার বছর বারো-তেরো বাদে, বাষট্টি কি তেষট্টিতে। ঠিক হলপ করে বলতে পারব না, মোটা-মুটি ঐ সময়টাই।

রামকৃষ্ণ মিশনের সাধুদের মতোই কাছা-খোলা পাটকরা গেরুয়া বহি-র্বাস, হাতকাটা খাটো মাপের খাকি পাঞ্জাবী—তবে তাঁদের মতো ন্যাড়া মাথা নয়, রীতিমতো জটাবদ্ধ কেশ। বারো-তেরো বছরে—অর্থাৎ যখন এখান থেকে সরে পড়ল তখন সে জটা রীতিমতো বিরাটহয়ে উঠেছে।

তবে একটা বিষয়ে সাধারণ সাধুদের সঙ্গে বিষণদাসের তফাৎ ছিল। সে ভিক্ষা করত না, কোনোও মঠ কি আশ্রম করার চেষ্টা করে নি—কোনো ব্যবসাতেও যায় নি—মোট বয়ে খেত। স্টেশনের পাশেই এক-জনদের একটা অন্ধকার ছোটো কুঠ্‌রী ভাড়া করে থাকত, সন্ধ্যের পর নিজেই দুটি ভাত ফুটিয়ে খেত—তার পর গভীর রাত পর্যন্ত বসে বসে নাগরী হরপে ছাপা কী একটা মোটা গোছের ধর্মগ্রন্থ পাঠ করত। শোনা যায়, ওর বাড়ি-ও'লা বলেন, রাত বারোটার পর রেড়ির তেলের আলোটা নিভিয়ে শুয়ে পড়ত। কিন্তু উঠত খুব ভোরে। ভোরেই স্নান সেরে পূজা পাঠ করত, ধ্যান করত কিনা কেউ জানে না—কে আর অত ভোরে উঠে উঁকি মারবে?—তার পর বেরিয়ে পড়ত মোট বইতে।

দুটো রেশনের দোকান ছিল আমাদের পাড়াতে, সাধারণত সেইখানেই ওর কিছু কিছু মোট জুটত, না হলে স্টেশনেও যেত। তবে খুব ভারি মাল বইতে পারত না, বড় বড় বস্তা দেখলে হাত-জোড় করত।

বেশি দরকারও ছিল না। এক বেলা খাওয়া আর ঐ সাধারণ কাপড়-জামা, এতে আর কত লাগে। ঘরটারও ভাড়া ছিল মাত্র দশ টাকা। অব্যবহার্য ঘর, মানুষটাও নির্বিরোধী—তাই বাড়ি-ও'লা ঐ নামমাত্র

ভাড়াতেই থাকতে দিয়েছিলেন।

ওর ভাবভঙ্গী, আর স্বোপার্জনে দিন কাটানোতে আমাদের মনে হতো কোনো বড় ঘরের ছেলে, কোনো কারণে ব্যথা পেয়ে বাড়ি-ঘর ছেড়ে চলে এসেছে, কিন্তু সে আভিজাত্য বা আত্মসম্মান বোধ ছাড়তে পারে নি। লোকটি বিহার বা উত্তরপ্রদেশের লোক বলেই মনে হতো, তবে ঠিক কোন্ জায়গায় বাড়ি তা বলত না, বেশি পেড়াপীড়ি করলে বলত—'আমাদের আবার দেশ কি, যখন যেখানে থাকি সেটাই দেশ।' বেশ ভালোই বাংলা বলত, ঈষৎ একটু হিন্দুস্থানী টান ছিল বলে আর ঐ বিষণদাস নামেই বোধ হতো যে আমরা যাকে সাধারণ ভাবে পশ্চিম বলি, সেই অঞ্চলের লোক।

লোকটি এমনি নির্বিরোধী ছিল, কিন্তু মজুরী নিয়ে দরদস্তুর করলে কিংবা যা দেবার কথা তার চেয়ে কম দিলে চটে যেত।

কোনো কোনো লোক মোট-বওয়া সাধু দেখে বেশ সম্ভ্রমের সঙ্গে ব্যবহার করত—কিন্তু বেশির ভাগই ওর এই আচরণের মধ্যে মতলব খুঁজে বেড়াত, কেউ কেউ সে অভিসন্ধিটাকে নারী-ঘটিত বলে মনে করত। যারা পয়সা ফাঁকি দিত বা কম দিত তারাই এই অপবাদ দিয়ে নিজেদের বিবেককে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করত।

একদিন এই রকম একটা তুচ্ছ ব্যাপারেই একটা বড়-রকম গণ্ডগোল বেধে গেল। এক ভদ্রলোক পয়সা কম দিয়ে বিদায় দেবার চেষ্টা করছিলেন, সাধু রুখে উঠতে তিনি বলে বসলেন ; 'হ্যাঁ হ্যাঁ চিনি তোমাকে, মোট বওয়ার নাম করে অন্দর-মহলে ঢুকে মেয়েদের গায়ে পড়ার ফিকির তোমার। দেবো এক দিন উত্তম-মধ্যম ধোলাই, তোমার সাধু সাজা বেরিয়ে যাবে।'

বিষণদাসেরও এবার ধৈর্যচ্যুতি ঘটল। কথার পৃষ্ঠে কথা—ঝগড়ার মুখে হিসেব করে কথা বলাও যায় না সব সময়ে—ভদ্রলোক অপমানিত বোধ করে তার ছেলে ভাইপোদের ডাকলেন, সকলে মিলে প্রচণ্ড মার দিলেন লোকটাকে, ঠোঁট কেটে, নাক, মুখ দিয়ে রক্ত পড়তে লাগল। লোকটি উপস্থিত সকলের কাছে নালিশ জানাতে গেল—তাঁরা একটা

মিটমাট করে দেবার চেষ্টা করলেও ভদ্রলোকটিকে শাসন করতে সাহস করলেন না, কারণ এঁর বাড়িতে গুণ্ডা-গুণ্ডা অনেকগুলি ছেলে।

সাধু বিষণদাস এই অবিচারে একেবারে যেন স্তব্ধ হয়ে গেল। মোট বওয়া বন্ধ ক'রে তিন-চার দিন নিজের ঘরেই পড়ে রইল, তার পর এক-দিন ভোরে উঠে বাড়ি-ও'লাকে সে মাসের ভাড়া বুঝিয়ে দিয়ে এক বস্ত্রে বেরিয়ে গেল—শুধু বাড়ি ছেড়ে নয়, এ অঞ্চল ছেড়েই।

এর বছর কতক পরে—কত হবে?—চুয়াত্তর কি পঁচাত্তর ঠিক মনে নেই, দিল্লী থেকে ফেরার পথে এলাহাবাদে নেমে পড়লাম; হঠাৎই মনে হতে নামা, খবর-টবর কিছু দেওয়া হয় নি। এখানে আমার দিদির বাড়ি, সে দিদি অবশ্য নেই আর, তবে ভাগ্নে নিতাই আছে, সে যদিও কাজে (রেলের ইঞ্জিনীয়ার) এদিক ওদিক যায়, ছবি বৌমা তো থাকবেই—এই ভরসাতেই খবর না দিয়ে একেবারে কর্ণেলগঞ্জে গিয়ে উপস্থিত হলাম।

কিন্তু নেমে পড়ে একটু কুণ্ঠিতই হয়ে পড়লাম। ছবি আছে ঠিকই—তবে তার যেন কেমন উদ্‌ভ্রান্ত অবস্থা, সাজ-সজ্জা দেখে মনে হলো এখনই কোথায় সে রওনা দেব বলে প্রস্তুত—আমার এই আকস্মিক আগমনে ঠিক বিরক্ত হয়েছে বলব না—একটু যে বিব্রত হয়েছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই, আর এতই ব্যস্ততা যে সে তথ্য গোপন রাখাও সম্ভব হচ্ছে না। আমাকে চা-জলখাবার দিতে যেটুকু সময় নষ্ট হয়েছে সেটুকুও তার কাছে অসহ্য।

আমিও আর শাক দিয়ে মাছ ঢাকার চেষ্টা করলুম না, সোজাসুজি প্রশ্নই করলুম—'ব্যাপার কি বলো তো বৌমা, আমি এসে যেন অসু-বিধায় ফেললুম মনে হচ্ছে। লজ্জা করো না, সোজাসুজি বলেই ফেল—একটা দিন হোটেলে কাটাতে পারবো বেশ।'

'না না, তা নয়, ছিঃ! মানে কি জানেন মামা, এঁর এক বন্ধুর গুরুদেব, খুব বড় সাধু একজন—আজ সেই বন্ধুর বাড়ি আসছেন। ইনি তো ভোরেই উঠে চলে গেছেন, আজ কানপুর যাওয়ার কথা, সিক রিপোর্ট করে

সেটা ক্যানসেল করেছেন, তার কারণ, এই সাধু বড় একটা লোকালয়ে আসতে চান না। অনেক সাধ্যসাধনায় যদি-বা আসেন—বেশিক্ষণ থাকেন না। আজ এই বারোটা নাগাদ পৌঁছবেন, আবার সন্ধ্যাবেলাই বোম্বে চলে যাবেন। প্লেন চার্টার করাই আছে, এক ঘণ্টাও এদিক-ওদিক হবার উপায় নেই। অথচ তাঁর নাম শুনে বোধহয় হাজার খানেক অলরেডি জমা হয়েছে—আরও কোন্ না হাজার-খানেক এসে যাবে, বেশি তো কম নয়। এক এক জন করে গিয়ে প্রণাম করতেই তো এবেলা কেটে যাবে।'

তার পরই হঠাৎ যেন ছবির চোখ দুটিতে আশার আলো জ্বলে ওঠে। বলে, 'চলুন না মামা, এই কাছেই—বেশি দূর নয় এই তো কাটরায়। এ চান্স অফ এ লাইফ-টাইম। সত্যিকারের বড় সাধু একজন, মোটা-মোটা টাকা প্রণামী পড়ে, সাধু দুহাতে মুঠো মুঠো করে জনতার মধ্যে ছুঁড়ে দেন হরির লুঠের মতো করে। ঋষিকেশে বিরাট আশ্রম—কিন্তু তিনি থাকেন যমুনোত্রীর পথে এক গুহায়, সেখান থেকে বেরুতেই চান না। যাবেন? চলুন না।'

খুব যে ইচ্ছে ছিল তা নয়, শুধু ছবিকে দোটানা থেকে মুক্তি দিতেই রাজী হয়ে গেলাম। চা খেয়ে মুখে মাথায় জল দিয়ে কাপড় পালটে ছবির সঙ্গে গাড়িতে গিয়ে উঠলাম।

তবে ওখানে পৌঁছে যে দৃশ্য দেখলাম—তার জন্য প্রস্তুত ছিলুম না। বাড়ির সামনে সামিয়ানা খাটিয়ে বিরাট প্যাণ্ডেল করা হয়েছে, তার মাঝখানে একটা রুপোর সিংহাসন, পা রাখার ভেলভেটের তাকিয়া। চারিদিকে ফুলের মালায় শোভিত, সিংহাসনের উপর গেরুয়া রঙের রেশমী কাপড় বিছানো। মাটিতে কার্পেট পাতা—একেবারে রাজকীয় অভ্যর্থনার আয়োজন। আর তেমনি কি ভিড়। দু হাজার বলে বোধ হয় ছবি একটু ভুলই করেছে—এ তো জনসমুদ্র।

গুরুদেবের প্লেন লেট, নৈনীতে নেমে এখানে আসতে দেরি হবে। সে ব্যাপারে নিতাই তার স্ত্রীর হয়ে একটু প্রায়শ্চিত্তই করল, ভেতরে নিয়ে গিয়ে লুচি, তরকারি, দই খাইয়ে দিল পেট পুরে। অর্থাৎ রাতের আগে

কিছু খাবার আর দরকার রইল না।

বেলা দেড়টা নাগাদ একটা হৈ চৈ শব্দ উঠল। দূরাগত মেঘ-গর্জনের মতো, তার পর শাঁখ, হুলুধ্বনি—তার মধ্য দিয়ে ভলান্‌টিয়াররা ভিড় ঠেলে গুরুদেবকে এনে যখন সিংহাসনে বসালো, তখন—যদিও অগণিত মালাতে প্রায় ঢেকে যাবার যোগাড় হয়েছে, তবু চিনতে পারলাম ঠিকই —আর সে চেনার ফলে আমার চক্ষুস্থির!

এ তো সেই বিষণদাস।

বয়স বাড়বার চিহ্ন দেখলাম শুধু জটায়, আর একটু বেড়েছে, এবং তার চুলগুলোয় পাক ধরে অনেকটা সাদা দেখাচ্ছে। নইলে চেহারার বিশেষ কোনো পরিবর্তন হয় নি, বরং কান্তি একটু বৃদ্ধিই পেয়েছে।

বহুলোক হুমড়ি খেয়ে পড়ল পায়ের কাছে, ভলান্‌টিয়াররা প্রাণপণ চেষ্টা করে ঘর্মাক্ত হয়ে উঠল কিন্তু সে ভিড়কে সুসংবদ্ধ করতে পারল না। ফল মিষ্টান্ন মালা এবং টাকার পাহাড় জমে উঠল। সাধু কিছু বিরক্ত মুখে ভ্রূকুঞ্চিত করে কি বললেন গৃহস্বামীকে—কিন্তু তিনি নিরুপায়।

অবশেষে একসময় ভিড় একটুখানি হাল্‌কা হতে নিতাই আমাকে সামিয়ানার পিছন দিয়ে নিয়ে গিয়ে অতিকষ্টে সামনে দাঁড় করিয়ে দিলে। সকলেই কিছু কিছু প্রণামী বা ভেট এনেছে, নিদেন ফুলের মালা—যা এখন গলায় দেওয়া সম্ভব নয়, পায়ে দেওয়া হচ্ছে—আমি কিছুই আনি নি, অগত্যা শুধুই একটা নমস্কার করে দাঁড়ালুম। প্রণাম করাই শোভন হতো, কিন্তু সে চেষ্টা করতে গেলে হয়ত হাসি পেয়ে যাবে—তাই যতটা সম্ভব হেঁট হয়ে নমস্কারই জানালুম।

আশে-পাশের লোক আমার ধৃষ্টতা বা ঔদ্ধত্যেই অবাক হয়েছিল। তাদের আরও অবাক করে দিয়ে গুরুদেব সামনের দিকে ঝুঁকে হাত বাড়িয়ে আমার হাত চেপে ধরে বললেন—'ডাক্তারবাবু, ভালো আছেন? আমি আপনাকে আগেই দেখেছি।'

আমি কি বলব, আগের কথা তুলব কিনা, তোলা উচিত হবে কিনা ভাবতে ভাবতেই সাধু আবার বললেন—'দেখছেন তো আমার হাল! এক কোণে বসে দীন ভাবে ভগবানকে ডাকার চেষ্টা করব, এই ছিল

আমার সংকল্প। আপনারাই আমাকে এই রাজগীরের দিকে ঠেলে দিলেন। সে দিন কী যে দুর্মতি হলো—মনে করলুম ভেখ ছাড়া এ দুনিয়ায় যখন কারও চলার উপায় নেই, ঠাট ছাড়া অন্য বাট বা পথ নেই—তখন ঐ পথই ধরব। মনের মধ্যে এ ভাবটা থাকা উচিত হয় নি—এটা প্রতি-হিংসারই চিন্তা, সাধু যে হবে তার এ শোভা পায় না। অন্যায় করে-ছিলুম বলেই বোধহয় ভগবান এই শাস্তি দিলেন। হ্যাঁ, প্রতিশোধের সাধ পূর্ণ হয়েছে, ষোল আনার ওপর আঠারো আনা, সে সাধন বাবু আমার পায়ে ধরে দীক্ষা চেয়েছেন, কিছুতেই ছাড়েন নি, কান্নাকাটি করে তা আদায়ও করেছেন। কিন্তু আমি এ কি জাঁতাকলে পড়লুম। যত পালাতে যাই ততই সেটাকে আমার মহত্ত্ব বলে ধরে নেয় এরা। তাই আষ্টে পিষ্টে বাঁধার চেষ্টা করে। আমি যে ভগবান থেকে অনেক দূরে সরে যাচ্ছি এইভাবে!'

বলতে বলতে মনে হলো গুরুদেবের গলা কেঁপে উঠল আবেগে আর অনুশোচনায়।

রূপান্তর

পেনিটির বাঁড়ুয্যে মশাইয়ের সাধু-দেখা বাতিকের কথা এর আগেও লিখেছি আমি, আপনারা কেউ কেউ পড়ে থাকতে পারেন। বেশি গল্প যাঁরা শুনতে চান—গিয়ে আলাপ করে আসতে পারেন। তাঁর আপিসেও যেতে পারেন।

আসলে এ বাতিকটা ছিল তাঁর মায়ের। মার সঙ্গেই ঘুরতেন মাধববাবু। এখন মার অবর্তমানে বাতিকটা তাঁকে অর্শেছে! তবে অতটা হয়তো আর পেরে ওঠেন না। আজকাল যাওয়া-আসার খরচও তো অনেক বেশি।

সেদিন যে গল্পটা বলে গেলেন বাঁড়ুয্যে মশাই সেটাই লিখছি। সামান্য একটু রঙ দেওয়া ছাড়া কিছু করি নি। এমনি অবিকলই তিনি বলেছিলেন।

সে যাত্রা বিন্ধ্যাচল গিয়েছিলেন। কোথায় কোন্ সাধু আছেন খোঁজ করতে করতে জানা গেল পাহাড়ের খুব ওপরে একটা গুহামতো আছে, তাতেই এক সাধু থাকেন। তিনি নাকি ত্রিকালজ্ঞ, ইচ্ছামাত্রে যা খুশি করতে পারেন—তবে খেয়ালী, সহজে তাঁকে, 'কব্জা' করা যাকে বলে, তা করা যায় না। একটু রগ-চটাও।

ব্যস, আর যায় কোথায়। না দেখেই, শোনামাত্র বাঁড়ুয্যে মশাইয়ের মার ভক্তি বেড়ে গেল। পরের দিন শেষরাত্রে উঠে স্নান ইত্যাদি সেরে কিছু ফল ফুল নিয়ে ছেলের সঙ্গে পাহাড়ে যাত্রা করলেন।

লোকালয়ের বাইরে অনেক উঁচুতে সে গুহা। দারুণ চড়াই, অন্তত ওঁদের যা লেগেছিল। খুব ভোরেই রওনা দিয়েছিলেন, তবু হাঁপাতে হাঁপাতে ঘর্মাক্ত কলেবরে যখন কাছাকাছি গিয়ে পৌঁছলেন তখন আটটা বেজে গেছে।

গুহার ঠিক নিচেই একটা ছোট্ট ঘর। বড় বড় পাথরের নুড়ি, আর

ওপরে টিনের চাল দিয়ে তৈরী। পাছে সে টিন উড়ে যায় সেজন্যে তার ওপরও গোটাকতক ভারী পাথর চাপানো।

এখানে কি? কে থাকে? না কি এইটাই সেই গুহা?

মনে প্রশ্ন জাগার আগেই একটি হাফ-সাধু গোছের লোক বেরিয়ে এলেন। মানে জটা হয় নি—ঝাঁকড়া চুল; সর্বাঙ্গে ছাই মাখা নয়, শুধু কপালে আর বুকে একটু একটু; বেরিয়ে এসে হিন্দীতেই প্রশ্ন করলেন, 'আপনারা কি ওপরের মহাৎমাকে দর্শন করতে যাচ্ছেন?'

বাঁড়ুয্যে মশাই জানালেন, সেই রকমই তাঁদের অভিপ্রায়।

'কিন্তু আপনি?' জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চাইলেন মাধববাবু, 'ওঁর শিষ্য?'

'নেহি নেহি, উন্‌হোনে কোইকো দিক্‌ষা নেহি দেতে হেঁ! ময় উন্‌কে এক দীন সেবক হুঁ। এয়সাহি দেখ্‌ভাল করতে হেঁ।'

তারপর বললেন, 'যাইয়ে আপ লোক, লেকিন গুহামে মৎ ঘুষিয়ে গা, বাহার বৈঠা রহনা, যব খুশি হোগা, উও আপনাহি নিকল আয়েঙ্গে।'

সেইমতোই উঠে গেলেন ওঁরা।

অন্ধকার গুহা, ভেতরে অনেকখানি বিস্তৃত। সাধু কোথায় আছেন বাইরে থেকে কিছুই দেখা যায় না। তবে আছেন নিশ্চয়ই, ভক্তটি যা বললেন। সেই আশ্বাসেই ওঁরা দু'জনে সামনের সামান্য চত্বরমতো পাথরটায় স্থির হয়ে বসে রইলেন।

আর বসে থাকতে থাকতেই লক্ষ্য করলেন, গুহায় ঢোকার মুখে ডান-হাতি একটা চৌকো বড় পাথর, তার ওপর একখানা চটের বস্তা দু-পাট করে পাতা। এইখানেই এসে বসেন নাকি? সাধুরা তো, শুনেছেন, কম্বলের আসন কিংবা অজিনাসন ছাড়া বসেন না।

যাই হোক, বেশীক্ষণ ওঁদের অপেক্ষা করতে হলো না। কিছু পরেই যেন বিরক্ত ভাবে ভ্রূকুটি করে বেরিয়ে এলেন এবং সোজা গিয়ে সেই পাথর-টার ওপরেই বসলেন সাধুটি।

এঁরা উঠে গিয়ে উপুড় হয়ে প্রণাম করতেই খুব রূঢ় কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন, 'কাহে আয়া হিঁয়া? কেয়া মাংতা? রূপেয়া?'

বলতে বলতেই চটের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে কী যেন বার করে হাতটা

খুলে ছড়িয়ে দিলেন, ঝন ঝন করে অনেকগুলো টাকা ছড়িয়ে পড়ল। আসল চাঁদির টাকা।

বাঁড়ুয্যে গিন্নী ব্যাকুল হয়ে কি বলতে গেলেন—সাধু 'চোপ!' বলে একটা হুঙ্কার দিয়ে উঠে বললেন, 'তব কেয়া? কাপড়া? এহি লেও: ভাগো—'

আবারও সেই চটের খাঁজে হাত ঢুকল—বেরিয়ে এলো একখানা গরদের থান ধুতি।

এবার বাঁড়ুয্যে মশাইয়ের মা যেন মরীয়া হয়ে বলে উঠলেন, 'বাবা আমরা ভগবানের কথা, ব্রহ্মের কথা শুনতে এসেছি। তাঁকে পাবার উপায়!'

সাধু তাঁদের দিকে পাশ ফিরে নিচের দিকে মুখ করে ডাকলেন, 'সীতা-রাম, এ সীতারামোয়া!'

শশব্যস্তে প্রায় ছুটতে ছুটতে উঠে এলেন সেই নিচের সেবকটি।

এঁদের দিকে না চেয়েই আঙুল দিয়ে দেখিয়ে সীতরামকে আদেশ হলো—'ইনলোককো ফেক্ দেও নিচে। কাহে আতা হ্যায় ইলোক—সিফ´ দিক্কত করনে কে লিয়ে!'

এঁরাও শুনেছিলেন, আদেশের মর্মও বুঝতে অসুবিধা হয় নি। ভয় পেয়ে উঠতেই যাচ্ছিলেন—সেবক মহারাজ হাত নেড়ে ডেঞ্জার সিগন্যাল দিলেন।

এঁরা তো পালাতে পথ পান না। সত্যিই নিচে ফেলে দেবে নাকি? হুড়মুড় করে ছুটতে ছুটতে নেমে একেবারে সেবক মহারাজের টিনের কেল্লার সামনে পৌঁছে হাঁপ ছাড়লেন।

'ব্যাপার কি মহারাজ?'

শোনা গেল, বিষয়ী গৃহীরা গুহার বাইরে বসে থাকলেও ওঁর তপস্যার ব্যাঘাত ঘটে। এমনি যখন একা বাইরে চুপ করে বসে থাকেন—তখন কেউ এলে স্বাভাবিক ভাবেই কথাবার্তা বলেন, কিন্তু যখন ভেতরে আসনে বসে থাকেন তখন গৃহী কেউ এলেই ওঁর অস্বস্তি হয়, মন চঞ্চল হয়ে ওঠে। তাও, বাইরে যখন থাকেন—কেউ ভগবানকে পাবার কথা জিজ্ঞেস

করলেই দারুণ চটে যান। বলেন, 'ব্যাটারা সস্তায় ভগবানকে পেতে চায় সাধুকে ধরে, মহা পাপী আর পাজী এরা!

সেবারে সেই পর্যন্ত।

এর বছর-দুই পরে একবার অযোধ্যায় এসে শুনলেন, লক্ষ্ণৌতে মিলিটারী ছাউনির কাছে এক মহাৎমা ডেরা ফেলেছেন, খুব ভারী সাধু তিনি, উচ্চকোটির সাধক!

অতঃপর লক্ষ্ণৌ যাওয়া ছাড়া মাধববাবুর গতি কি!

লক্ষ্ণৌতে গিয়ে এক ধর্মশালায় উঠে ওঁরা পরের দিন ভোরেই রওনা হলেন ছাউনির দিকে। খুঁজে খুঁজে সে ডেরাও পাওয়া গেল। ছাউনির মধ্যেই বলতে গেলে। শোনা গেল ছাউনির সাম্প্রতিক সর্বাধ্যক্ষই এই জমিটুকু বার করে দিয়েছেন সাধুর আবাসের জন্যে।

একটিই ঘর, তবে বেশ বড়। তার একপ্রান্তে সাধুজী বসে আছেন একটা চটের থলির ওপর, সামনে একটা গুঁড়ি-কাঠে আগুন জ্বলছে—অর্থাৎ ধুনি। একপাশে কতকগুলো চেলা কাঠ জড়ো করা, একটা সিংহলী নারকেল মালার কমণ্ডলু আর একটা চিমটে মেঝের এক কোণে পোঁতা। লাল পাথরের চৌকো চৌকো পাথর বাঁধানো মেঝে, শুধু ঐ ধুনির জায়গাটায় বাঁধানো হয় নি, সেখানে মাটিই আছে।

এগুলো বাইরে থেকেই দেখা গেল। ঘরে ঢুকে দেখলেন দুটি ব্যাপার। এক, সাধুটি সেই বিন্ধ্যাচলেরই সেই মহাৎমা—আর লম্বা ঘরটার এক প্রান্তে একটা সিঁড়ির মতো নেমে গেছে মাটির মধ্যে।

দেখে তো ভয়ে হিম হয়ে গেল বুকের মধ্যেটা। আবার সেই রকম বাইরে কোথাও ফেলে দেবার হুকুম হবে না তো! কিংবা নিচের ঐ গুহাতে বা গর্তে!

দুটোর কোনোটাই সাধুজী করলেন না অবশ্য। তবে যা করলেন সেও বড় কম নয়।

বাঁড়ুয্যে গিন্নী সঙ্গে আনা ফুল ও বড় বড় কটা আতা ও আপেল ওঁর সামনে মাটিতে নামিয়ে রেখে যেমন পায়ের ওপর মাথা রেখেছেন—

মহারাজ একটা চেলা কাঠ তুলে নিয়ে বসিয়ে দিলেন, বেশ জোরে এক ঘা--তাঁর পিঠে।

মাধববাবুর মা 'বাবাগো' বলে চেঁচিয়ে উঠলেন---কিন্তু উঠে পালাতে পারলেন না, সে সামর্থ্য ছিল না, এতই লেগেছিল শিরদাঁড়ায়। মাধ-ব বাবুই বেগতিক দেখে কোনোমতে মাকে টেনে হিঁচড়ে তুলে তাড়া-তাড়ি বাইরে নিয়ে এলেন।

অতঃপর একটু সুস্থ হয়ে বাড়ি ফেরারই কথা, এবং সেই সঙ্গে সাধু দেখার শখ নিবৃত্ত হওয়ারও– কিন্তু দেখা গেল মাধাববাবুর মা সে ধাতুতে গঠিত নন। দুদিন অবশ্য একেবারে শয্যাগত হয়ে রইলেন, ধর্ম-শালার ম্যানেজারকে বলে, কিঞ্চিৎ 'হাত উপুড়' করে—আরও কয়েক-দিন থাকার অনুমতি আদায় করে নিয়েছিলেন, কিন্তু একটু ওঠার মতো হতেই ছেলেকে বললেন, 'কাল আবার ঐ বাবার কাছে যাই চল!'

'কী বলছ তুমি মা। আবার! এবার গেলে বোধহয় ঐ চিমটেটাই বসিয়ে দেবেন বুকে।'

'ওরে, না রে না। শুনেছি ওঁরা নানা রকমে পরীক্ষা করেন ভক্তদের। আসল না ভণ্ড যাচাই করতে চান। চল না। যদি সাধুর হাতে মৃত্যু হয় —সে তো ভালোই।'···

দেখা গেল মার কথাই ঠিক।

সেদিন যেতে সাধুজীর অন্য মূর্তি।

মা প্রণাম করে উঠতে খুব সস্নেহ কণ্ঠে বললেন, 'সেদিন বড্ড লেগে-ছিল, না রে!'

বাঁড়ুযো গিন্নী বৃথা বিনয় করলেন না। বললেন, 'হ্যাঁ বাবা, দু'দিন একে-বারে উঠতেই পারি নি। এখনও সোজা হয়ে শুতে পারি না।'

'আসিস কেন? ভগবানকে চাই শুনলেই আমার মাথায় আগুন জ্বলে। ভগবানকে পাওয়া কি অত সোজা রে! এ কি গাছের ফল যে পেড়ে দেব! বহুৎ কষ্ট করতে হয়, তবে মেলে। এত তো তপস্বী সাধু দেখিস, এরা এত কষ্ট করছে তাই কি সবাই পেয়েছে! পায় যা তা কতগুলো

সিদ্ধাই। ম্যাজিক দেখাতে পারে। অন্য কিছু চাই তো বল্—ব্রহ্ম ভগবান ওসব কথা বলিস না।'

মাধববাবুর মা হঠাৎ বলে বসলেন, 'বাবা আমার বড় ইচ্ছা, আপনাকে রান্না করে খাওয়াব। এই ইচ্ছাটা অন্তত পূরণ করুন।'

সাধু হাসলেন। বললেন, 'বেটি তুমি বড় চালাক। ব্রাহ্মণের মেয়ে হলে কি হয়—বেনিয়ার বুদ্ধি। আচ্ছা, তাই হবে, নিয়ে আসিস কাল, কি খাওয়াবি।'

মা অবাক হয়ে বললেন, 'কি করে বুঝলেন আমি ব্রাহ্মণের মেয়ে?'

'আরে বেঅকুফ, ওতে কিছু সিদ্ধাই-এর দরকার হয় না। চালে-চলনেই বুঝতে পারি। আর ব্রাহ্মণ বলেই মার খেয়েও আবার এলি।...যাক্ সে কথা, যা ঐ সিঁড়ি দিয়ে নেমে যা। ওখানে এক স্বয়ম্ভু শিব আছেন, দর্শন করে যা।...আলোর দরকার নেই, বড় প্রদীপ জ্বলছে।'

ওঁরা দু'জন, মা আর বেটা—সন্তর্পণে সঙ্কীর্ণ সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে গেলেন। অনেকটা নিচে, অপরিসর মন্দির। একজন মাত্র বসে পুজো করার স্থান আছে। পাথরেরই একটা গর্ত মতো, তার মাঝখানে একটা এবড়ো-খেবড়ো পাথর উঁচু হয়ে আছে। মানুষের হাতে কাটা শিবলিঙ্গ নয়, প্রকৃতির তৈরি, অর্থাৎ সত্যিই স্বয়ম্ভু। গর্তটা জলে ভরে আছে। তার একটুখানি পাড়ে একটা মাটির পিলসুজে বড় চেরাগ জ্বলছে, তার পাশে একটা ডমরু। পাথরের দেওয়াল, কিছুটা ইটেও বাঁধানো—তাতেই একটা ত্রিশূল আর একটা শিঙা। অন্য কোনো জিনিস কি পুজোর আয়োজন নেই।

সাধু সঙ্গে সঙ্গেই নেমেছিলেন। তবে নিচে আর দাঁড়াবার জায়গা নেই। সিঁড়ি থেকেই বললেন, 'মন দিয়ে পুজা কর বাবাকে, জল ফুল লাগবে না, ইচ্ছা হয় ঐ কুণ্ডের জল তুলে নিয়েই বাবার মাথায় দিতে পারিস। পাতাল-গঙ্গার জল—ঐখানে আপনিই আসে পাথর চুঁইয়ে, আবার বেশি জলটা কোথা দিয়ে নেমে যায়—কেউ জানে না।'

তিনি উঠে গেলেন। মাও শিবপূজার মন্ত্র পড়ে পূজা সেরে, মুখে গাল-বাদ্য করে ওপরে উঠলেন মাধববাবুর সঙ্গে।

আজ সব দিক দিয়েই আনন্দের দিন তাঁর, তৃপ্ত মনে ধর্মশালায় ফিরলেন।

রাত্রেই বাজার করা ছিল। পরের দিন ভোরে উঠে নতুন "আঙ্গোঠি"তে* নতুন হাঁড়ি কড়ায় রান্না চাপিয়ে দিলেন মাধববাবুর মা। দশটার মধ্যেই রান্না শেষ হলো। ঘিভাত, ছানার ডালনা, ডাল, কপির তরকারী এবং পরমান্ন মাটিরই পাত্রে করে সব গুছিয়ে নেওয়া হলো, কেবল পায়সটা মাটির পাত্রে দিতে রাজী হলেন না মা। ঘুরে ঘুরে নিজস্ব নিভৃত পুঁজি ভেঙে রাত্রে একটা রুপোর বাটি কিনেছিলেন—সেইটেতেই পায়স ঢেলে নিয়ে গেলেন। বললেন—'এটা বাবাকে রেখে দিতে বলব। নিতান্ত না নেন, বলব শিবপুজোর জন্যে রেখে দিতে, উনি না থাকলেও কোনো-না-কোনো ভক্ত কি সেবক তো পুজো করবে ওখানে থেকে!'

মাধববাবুর সে বিষয়ে ঘোর সন্দেহ ছিল কিন্তু কিছু বললেন না। মার এত সাধ, তাছাড়া টাকাটাও তো তাঁরই।

সাধুর ডেরায় ওঁরা পৌছলেন এগারোটার মধ্যেই। সাধু দূর আকাশের দিকে চেয়ে স্থির হয়ে বসে ছিলেন, ওদের দেখেই বললেন, 'এখানে নামাস না বেটি, নিচে গিয়ে শিবজীকে নিবেদন করে দে। তারপর, এইখানে পাতা ঢাকা দিয়ে রেখে যা। আমি যখন হোক একটু একটু খাবো, কথা দিচ্ছি। একজন সেবক আছে আমার, সে আসে দুটোর পর। সেই সময় খেয়ে, তাকে প্রসাদ নিতে বলব।'

'কিন্তু সব ঠাণ্ডা হয়ে যাবে যে বাবা ততক্ষণে—' মা বলেন।

'না, হবে না। শিবজীর প্রসাদ যে, গরমই থাকবে।'

শুধু এইটুকু উত্তর দিয়ে তিনি মৌনী হয়ে যান। মারও আর ঘাঁটাতে সাহস হয় না। তিনি, যথা-আদিষ্ট শিবকে নিবেদন করে গুছিয়ে রেখে প্রণাম করে বেরিয়ে যান।

পরের দিন সকালের দুন এক্‌সপ্রেস ধরে ফেরবার কথা। আটটায় গাড়ি—আর ছাউনি পর্যন্ত যাবার প্রশ্নই ওঠে না।

এর বছর তিনেক পরেই হরিদ্বারের কুম্ভ।

* লোহার উনুন—কাঠকয়লায় রান্না করা যায়।

মাধববাবু আর তাঁর মা যাবেন, সে তো নিশ্চিতই। কোনো কুম্ভই এ পর্যন্ত বাদ দেন নি। প্রয়াগ, উজ্জয়িনী, নাসিক, হরিদ্বার—সবই হয়ে গেছে। তবু আর একবার স্নান করতে দোষ কি ?

অমাবস্যায় স্নান আর সংক্রান্তির স্নানের মধ্যে এবার সাত-আটদিন দেরি। এ সময়টা ওপারে সাধুদের 'কলোনী'র মধ্যে ঘুরে বেড়ানোই প্রশস্ত। আর তো কোনো কাজও নেই, সাধু দেখাই তো আসল উদ্দেশ্য।

সেদিন বিকেলবেলা সেই ভাবেই ঘুরতে ঘুরতে অনেকটা দূর গিয়ে পড়েছেন—এবার ফেরা উচিত ভাবছেন, হঠাৎ সামনে এক অপূর্ব দৃশ্য নজরে পড়ল। দৃশ্য বলছি এইজন্যে যে, দেখবার মতো বলেই—আসলে একটি মানুষই। এক তরুণ সাধু।

সাধু বিভিন্ন স্থানে ও নানা কুম্ভে অনেক দেখছেন, কিন্তু এমনটি আর কখনও চোখে পড়ে নি। এ যেন তরুণ শিব। তেমনি বালার্ক-দ্যুতি ; মসৃণ ভস্মাচ্ছাদিত ললাটে যে ঔজ্জ্বল্য, তা দেখে চন্দ্রশেখরের কথাই মনে পড়ে ; মনে হয় জটার চন্দ্রালোক পড়েই কপালে এই স্নিগ্ধ দীপ্তি ফুটে উঠেছে। সামান্য জটা চূড়াকারে বাঁধা, গোঁফদাড়ি সামান্য—বয়স বোধহয় একুশ-বাইশের বেশী হবে না—কিন্তু তাতেই কি সুন্দর দেখাচ্ছে। দীর্ঘ দেহ, পেশীবহুল নয়, সুগঠিত। উজ্জ্বল শুভ্র বর্ণ—যা কোনো ভস্ম কোনোদিন আচ্ছাদিত বা ম্লান করতে পারে না কোনো দিন - সব জড়িয়ে চোখই শুধু জুড়িয়ে গেল না, দু'জনেরই মনে একটা মুগ্ধ বিহ্বলতা দেখা দিল। দু'জনেই যেন একসঙ্গে 'বাবা' বলে ডেকে উঠে তাঁর পায়ের সামনে প্রায় আছড়ে পড়লেন।

একটা অস্ফুট কণ্ঠে 'নারায়ণ !' 'নারায়ণ ! ধ্বনি শুনতে পেয়েছিলেন—মানুষের চিহ্ন বলতে এই, নইলে মনে হতো ছায়া, নিজেদের অভিলাষের স্বপ্নমূর্তি – সে কণ্ঠস্বরও যেন মধুঝরা, মধুক্ষরা নামের সঙ্গে মেলানো—কিন্তু দু'জনেই আবার যখন ঈষৎ প্রকৃতিস্থ হয়ে ধুলোর ওপর থেকে মাথা তুললেন, চেয়ে দেখলেন—তখন সে সাধুর কোনো চিহ্নই কোথাও নেই। শুধু উনি যেখানে দাঁড়িয়ে ছিলেন—সেইখানে পড়ে আছে একটি বাটি, রুপোর বাটি !

গৃহী-সাধু

সাধুটিকে দেখেছিলাম ছোট একটি পাহাড়ী শহরে। নাম না-ই বা বললুম, নাম করলেই সবাই চিনবেন, আর তারপর পাঠকদের মধ্যে যদি কেউ রিপোর্টার থাকেন—সেখানে গিয়ে সাধুকে খুঁজে বার করে তাঁর জীবন অতিষ্ঠ করে তুলবেন।

সাধুটি সকালের দিকে নদীতে স্নান করে বুক সমান জলে দাঁড়িয়েই অনেকক্ষণ ধরে ধ্যান বা তপস্যা করতেন—বেলা নটা-সাড়ে নটা পর্যন্ত। তারপর উঠে ভিজে গায়ে বিভূতি মেখে ভিক্ষায় বেরোতেন। ভিক্ষা করতেন গৃহস্থ বাড়ি বা বাজারে। পয়সা নিতেন না, চাল ডাল আটা আনাজ বা তৈরি খাবার—এই সবই নিতেন। লাড্ডু কি ক্ষীরের বরফিও নিতেন।

এতো জিনিস নিতেন—কিন্তু এসব পাক করেন কখন, আর এত খান—এ কি রকমের সাধু!

তবু তখনও পর্যন্ত খুব একটা উগ্র কৌতূহল বোধ করি নি। এমন পেট-টালা বা পেটুক সন্ন্যাসীর তো অভাব নেই। শুধু ঐ বরফ-গলা জলে দাঁড়িয়ে তপস্যা করার সঙ্গে এই—যাকে মহাপ্রভু বলেছেন 'রসনা'-ল্যাম্পট্য' ঠিক নাকি খাপ খায় না বলে মধ্যে মধ্যে একটু বিস্ময় বোধ করতুম, হিসেবের দুটো প্রান্ত মেলাতে পারতুম না বলে।

কৌতূহলটা উগ্র হয়ে উঠল এক ভাণ্ডারায় গিয়ে। রামকৃষ্ণ আশ্রমের ভাণ্ডারা (ঠাকুরের জন্মদিন উপলক্ষে বোধ হয়। আজ আর ঠিক মনে নেই)—সাধুরাই প্রধান লক্ষ্য হলেও, স্থানীয় ভক্তরা আমন্ত্রিত হবেন, এই-ই নিয়ম। আমি ভক্ত কতটা জানি না, কলকাতা থেকে আসা বাঙালী ভদ্রলোক বলেই—আমিও বাদ পড়ি নি।

সামনের একটা মণ্ডপে সাধুদের স্থান হয়েছে—আমরা তার সামান্য দূরে একটি ছোট দালান মতো জায়গায় বসেছি। ওদিকে সাধুদের মধ্যে

যাঁরা প্রথম সারিতে বসেছেন তাঁদের আহার ও আহার্য পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে।

সামনেই দেখি সেই সাধুটি। বেশ উৎফুল্ল হয়ে উঠলুম। সাধুটি কত খান—বসে বসে দেখব।

প্রাথমিক বেদমন্ত্র পাঠ ইত্যাদি হয়ে যাবার পর—সাধুরা সকলেই পায়েসের ঠোঙা মুখে তুলবেন। বড় বড় কাঁচা শালপাতার দোনা; বাটির মতো করে তৈরি। তাতেই পায়ের দেওয়া হয়েছে, এক এক সাধু সেই আধসেরী মাপের চার পাঁচ দোনা ক'রে পায়েস বা ক্ষীর খেলেন। তারপর হাত বাড়ালেন পান্তুয়া ও লাড্ডুর দিকে। ঘরে কাটানো ছানায় পান্তুয়া—ঘিয়ে ভাজা এদেশে অপ্রাপ্য। সুতরাং তার সদ্ব্যবহারও যথেষ্ট হলো। লাড্ডুও পাঁচ-সাতটার কমে কেউ থামলেন না। এদেশে আগেই মিষ্টান্ন খাওয়ার রীতি—এঁরা বুদ্ধিমান, বাজেলুচি তরকারি দিয়ে পেট ভরান না।

সবই দেখছি, আমার সেই বিশেষ সাধুটিকেও লক্ষ্য করছি। কিন্তু তাঁর ব্যাপার দেখে খুব অবাক হয়ে গেলাম।

প্রথম পায়েসের দোনায় একবার মাত্র যেন জিভ ঠেকিয়েই রেখে দিয়ে চুপ করে বসে রইলেন সাধু। পান্তুয়া বা লাড্ডুতে আঙুলও ঠেকালেন না। তারপর যখন কচুরি ও আলুর ভর্তা এলো তখন একখানি মাত্র কচুরি ও একটু আলু খেয়ে সেই যে নিরস্ত হলেন—আর কিছুই মুখে তুল-লেন না। পাতেও নিলেন না।

এই কৌতূহল সত্যিই অসম্বরণীয় হয়ে উঠল। একবার ভাবলুম হয়ত নিজে একবার কিছু পাকিয়ে খেয়ে ভাণ্ডারায় এসেছেন। কিন্তু তাঁর ক্লান্ত শুষ্ক মুখের দিকে চেয়ে তা মনে হলো না।

ধ্যান সেরে ভিক্ষায় বেরিয়েছিলেন দেখেছি। অল্প কিছু পরে বাজার থেকে বেরিয়ে দ্রুত ওপরের দিকে উঠে গেলেন। কোথাও গিয়ে রান্না খাওয়া সেরে এখানে ঠিক পৌনে বারোটায় পৌঁছনো সম্ভব নয়।

সারাদিন ভেবে একটা মতলব ভাঁজলুম। মেয়েরা যে সেকালে আড়ি পাতত, সেই রকমই কোনো উপায় ঠিক করতে হবে—অর্থাৎ পিছু নিতে

হবে। মনে প্ল্যানও একটা ঠিক হয়ে গেল প্রায় তখনই।

উনি তপস্যা সেরে উঠে কোনো কোনো দিন তিন-চারটে গৃহস্থ বাড়ি গিয়ে ঝুলি পাতেন। তারপর বাজারে আসেন। কোনো দিন বা বাজারেই, কাজটা সেরে দ্রুত ওপরের দিকে উঠে যান—এটা দেখেছি। ওঁর ঝুলির একটা মাপ আছে বোধহয়—সেই মতো খাদ্যবস্তু সংগ্রহ হয়ে গেলে আর ভিক্ষা করেন না—নিজের আস্তানার দিকে চলে যান।

এই যাওয়াটা হয় এগারোটা নাগাদ। আমি সেই সময় ধরে বাজারের পথে অপেক্ষা করতে লাগলুম। বেশীক্ষণ অপেক্ষা করতেও হলো না। ঠিক এগারোটার সময়ই উনি বেরিয়ে এদিকের একটা পাকদণ্ডী পথে উঠতে শুরু করলেন।

সোজাসুজি পিছু নিতে অসুবিধা হতো। একটু তো পায়ের আওয়াজ হবেই। এক্ষেত্রে একটা উপায় হয়ে গেল। ঠিক এই পথেরই সমান্তরাল আর একটা পথ ছিল, এও পায়ে চলা সরু পথ, কিন্তু একটু বেশী খাড়া। তাতে আমি ওঁর পিছনে থাকলেও আমার দৃষ্টির বাইরে যেতে পারলেন না।

খানিকটা যাবার পরই একটা স্বাভাবিক গুহামতো জায়গা চোখে পড়ল—মানে ঠিক অন্ধকার গুহা নয়। ওপরে একটা পাথর বেরিয়ে আছে চালের মতো। তার সামনে একটুখানি সমতল জায়গা—সেখানেও কতকগুলো ডাল পাতা দিয়ে একটা আচ্ছাদন করা আছে।

তার নিচে দেখলাম একটা খাটিয়া পাতা, শুধুই খাটিয়া, তাতে বিছানা-পত্র কিছু নেই, সে খাটিয়ায় শুয়ে আছে একটি স্ত্রীলোক। কেমন দেখতে তা আজ আর বোঝার উপায় নেই, এত শীর্ণ এত রুগ্ন।

তার সামনে উবু হয়ে বসে একটি অতি বৃদ্ধা স্ত্রীলোক। সে একটা গাছের ডাল নেড়ে ঐ মেয়েছেলেটির মুখের মাছি তাড়াচ্ছে।

সাধু গিয়ে তাঁর ঝুলি থেকে একে একে ভিক্ষালব্ধ জিনিসগুলি নামালেন। কি জিনিস তা এত দূর থেকে সব পরিষ্কার বোঝা গেল না। তবে একটা আলু আর একটা কলা এখান থেকে নজরে পড়ল। মোট জিনিস সামান্যই। একজনেরও দু'বেলার খোরাক বলে মনে হলো না।

সাধু যখন ঝুলি আজাড় করছেন, খাটিয়ায় শোওয়া মেয়েছেলেটি ওঠার চেষ্টা করল। সাধু যেন কী সব বললেন, বোধহয় ওকে উঠতে বারণই করলেন, কিন্তু মেয়েটি শুনল না. অনেক কষ্টে তু'দিকের খাটিয়ার বাঁশ ধরে উঠে বসল—আর তখনই একটা জিনিস আবিষ্কার করলুম—মেয়েটির তুটো পা কাটা—প্রায় হাঁটুর ওপর থেকে।

শুধু কি এই জন্যেই এত রোগা, এত শ্রীহীন। মুখের গায়ের চামড়া যেটুকু দেখা যাচ্ছে কুঁচকে কুঁচকে গেছে—সে চামড়াও মনে হয় পার্চমেণ্ট কাগজের মতো পাতলা।

সাধু আরও কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে অল্প তু-একটি কথা বলে সেখান থেকে নেমে এলেন, তবে একেবারে নিচে নামলেন না—আর একটা সরু নুড়ির পথ ধরে (বোধহয় বর্ষার জল এই সব নালা দিয়ে বয়ে গিয়ে এই নুড়ি পাথরের সৃষ্টি করেছে) আমারই কাছাকাছি একটি বড় পাথরে এসে বসলেন।

আর তখনই লক্ষ্য করলুম, সেখানে একটা ঝিরঝিরে ছোট্ট ঝরণা গোছের আছে। সাধু হাত বাড়িয়ে তুই হাত পা ধুয়ে স্থির হয়ে দূর দিগন্তের পানে চেয়ে বোধহয় জপ করতে লাগলেন।

আমি আর বেশীক্ষণ নীরব দর্শক হয়ে থাকতে পারলুম না, আস্তে আস্তে উঠে ওঁর কাছে এলাম। তারপর একটা নমস্কার করে বললাম, 'এখানে একটু বসতে পারি ?'

আমি হিন্দীতেই প্রশ্ন করেছিলাম, তিনি পরিষ্কার বাংলায় জবাব দিলেন, 'এ তো সবই ভগবানের স্থান বাবা, আপনিই বা আমার অনুমতি চাইবেন কেন, আর আমিই বা দেবো কেন ? বসুন না, যেখানে খুশি, যদি পারেন। এ তো সব কুঁচো পাথর, হয়ত আপনার অসুবিধে হবে, আমি বরং নেমে বসি, আপনি এই পাথরটায় আসন নিন—।'

'না না। কিছু দরকার নেই।' বলে তিনি উঠে দাঁড়াবার আগেই আমি সামনে যেই 'উপলাস্তৃত' জমিতে বসে পড়লাম।

অতঃপর কি ভাবে কথাটা পাড়ব ভাবছি—তিনি যেন অন্তর্যামীর মতো প্রশ্ন করলেন, 'বাবু যেন আমাকে কিছু জিজ্ঞাসা করবেন বলে বোধ হচ্ছে!'

'করব ?' আমি কতকটা ছেলেমানুষের মতোই বলে ফেলি।

'স্বাচ্ছন্দে! আমিও যদি উত্তর দিই সত্য উত্তরই দেবো, এটুকু বলে রাখছি।'

'আপনি তো জটাজুটধারী সন্ন্যাসী, কিন্তু এখানে একটি গৃহীর আস্তানা করে রেখেছেন বলে মনে হচ্ছে। ভিক্ষার জিনিস এনে নামিয়ে দিলেন, মনে হচ্ছে সংসারের দায়িত্ব বহন করছেন একটা, যেমন সাধারণ গৃহস্থরা উপার্জন করে এনে স্ত্রীর সামনে নামিয়ে দেয় তেমনি!'

'হ্যাঁ, বাবু—উনি আমার স্ত্রী।'

'স্ত্রী ? মানে সন্ন্যাসের আগে সংসার করেছিলেন ?'

'সংসার যাকে বলে তা করি নি, তবু আমার স্ত্রীই, সেটাও অস্বীকার করার উপায় নেই।'

'তার মানে ?'

বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন সাধু। তারপর আস্তে আস্তে বললেন, 'বলেই ফেলি বাবা। ক্রীশ্চানদের শাস্ত্রে বলে অপরাধ স্বীকার করে ফেলতে পারলে তার মার্জনা পাওয়া যায় ঈশ্বরের কাছে।'

এই বলে আবারও কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন 'সাধু হওয়ার ইচ্ছা আমার বাল্যকাল থেকেই। তবে তখন মনে ছিল তান্ত্রিক সাধনা ক'রে সিদ্ধাই লাভ করব। প্রভূত শক্তি অর্জন করব। কিন্তু কোনো সৎ-গুরুর কাছে যাই নি, পাড়ায় এক ভণ্ড কপট তান্ত্রিক ছিলেন, তার খপ্পরে গিয়ে পড়লুম। কিছু কিছু বই পড়া ছিল—বি. এ পাস করেছিলুম, বছর কয়েক আইনও পড়েছি—একেবারে মূর্খ ছিলাম না, কিন্তু আসল জ্ঞান উপার্জন করতে পারি নি, সে বুদ্ধিও ছিল না।

সে অনেক কথা বাবা, কলুষিত কথা, সে সব বিস্তারের প্রয়োজন নেই; অল্প কিছুদিন পরেই সেই তান্ত্রিকের পরামর্শে আমি একটি ব্রাহ্মণ ষোড়শী কুমারী সংগ্রহে ব্যস্ত হয়ে পড়লাম। বেশী খুঁজতেও হলো না, আমারই এক আত্মীয়ার বৌদির বোনকে পাওয়া গেল। সেও আমার সাধনায় সাহায্য করতে উদ্‌গ্রীব। আসল কথাটা পরে বুঝেছি, যৌবনে আমার চেহারা ভালোই ছিল। মেয়েটি যে কোনো ভাবে আমার সান্নিধ্যে চেয়েছিল। অন্তরঙ্গতা কামনা করেছিল।

'তাই যেদিন শ্মশানে নিয়ে তাকে বসলাম—সেদিন সাধনা তপস্যা কিছুই হলো না, যা হলো উভয়ের কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করা।

'সেটা বুঝলাম ঘটনাটা ঘটে যাওয়ার পরে। নিজের মনের চেহারাটাও স্পষ্ট দেখতে পেলাম। প্রচণ্ড ধিক্কারে মন ভরে গেল, আর এক মুহূর্তও ইতস্তত করি নি, বাড়িও ফিরি নি, সেইখান থেকে সেই রক্তবস্ত্র পরা অবস্থাতেই দৌড়ে চলে এসেছি—শুধু সে শ্মশান ছেড়ে নয়, গ্রাম দেশছেড়ে।

'এক বস্ত্রে, কপর্দকশূন্য হয়েই বেরিয়েছিলুম কিন্তু ঐ লাল কাপড় আর রুদ্রাক্ষের মালার জন্য উপবাসও করতে হয় নি কিংবা ট্রেনের টিকিটও দেখাবার প্রয়োজন পড়ে নি। ঘুরেছি অনেক বাবা, তীর্থই বেশির ভাগ, মনের মতো গুরু মেলে নি। শেষে উত্তর কাশীতে গিয়েই মহাপুরুষ মহা যোগী গুরুদত্তজী মহারাজের দেখা পেলুম—'

বলতে বলতে জোড় হাত কপালে ঠেকালেন সাধু। কিন্তু থামলেন না। বলেই চললেন, 'ওঁকে দেখেই মনে হলো ইনিই আমার জন্ম-জন্মান্তরের গুরু, পথ প্রদর্শক। আছড়ে পড়লুম তাঁর পায়ে। কাঁদলুম খানিক, তারপর নিজের সব দুষ্কৃতি খুলে জানালুম তাঁকে। তারপর বললুম, আপনি আমাকে চরণে আশ্রয় দিন। কেমন করে সন্ন্যাসী হতে পারি, যথার্থ সাধক হতে পারি, সেই পথ দেখান।

'গুরুজী হাসলেন একটু। তারপর আমার মাথায় হাত দিয়ে একটুখানি চোখ বুজে বসে থেকে বললেন, 'কিন্তু তোমাকে তার আগে যে প্রায়শ্চিত্তটা সারতে হবে বেটা। সেই মেয়েটার সর্বনাশ করে পালিয়ে এসে জটা বেঁধে বেঁচে যেতে পারো, তাঁকে তো পাবে না। শোন, সে মেয়েটা তোমাকে ভালবেসেছিল। তোমাকে দোষ দেয় নি, তোমার কথা কাউকে বলে নি। পালিয়ে গিয়ে বহু দূরে কাঁচড়াপাড়ার কাছে রেলে চাপা পড়তে গিছল, পারে নি। দুটো পা কাটা গেছে। কাঁচড়াপাড়া রেলহাসপাতালে তিন মাস ছিল। প্রাণে বেঁচেছে, কিন্তু দেশে ফিরে যায় নি মা-বাবাকে কোনো খবর দেয় নি। তাঁদের মাথা হেঁট করতে চায় নি ওখানের এক বুড়ি ভিখিরী ওকে আশ্রয় দিয়েছে। সে-ই দুটো দিয়েছে। তুমি যাও, আমি একজনকে বলে দিচ্ছি, তোমাকে কিছু টা

দেবে, সেখানে গিয়ে ধর্মমতে তাকে বিবাহ করো, তাকে স্ত্রীর মর্যাদা দাও, তারপর তাকে নিয়ে এসো। তখন আমি তোমাকে সন্ন্যাস দেবো। তোমায় গৃহী জীবন যাপন করতে বলছি না। কাছাকাছি রাখবে, তুমি তোমার ধ্যান তপস্যা নিয়ে থাকবে। তবে তোমারই ভিক্ষার দ্বারা ওর ভরণ-পোষণ চালাবে, যতদিন ও বাঁচে।

'গুরুর আদেশ মাথায় করে নিয়েছিলাম বাবা। সে আদেশ অমান্য করতে সাহস হয় নি। বিশেষ যিনি অন্তর্যামীর মতো শুদ্ধ মাত্র আমাকে স্পর্শ করে সব কথা বলেদিলেন। সেই অন্তর্যামী মহাপুরুষের আশ্রয় পাবার জন্য লোলুপ হয়ে উঠেছি তখন।

'ওই আমার সেই স্ত্রী, ধর্মপত্নী। অগ্নি সাক্ষী করে ওকে বিবাহ করেছি। সেই বুড়ীও ওর মায়া ত্যাগ করতে পারে নি, সঙ্গে এসেছে। সেও গুরুর কৃপা নিশ্চয়ই। নইলে কে ওর সেবা করতো। দেহের আঘাতে তত নয়; মনের আগুনে পুড়ে ঝলসে গেছে, একেবারেই ভেঙে পড়েছে, ও এখন আধমরা। তবে সত্যিই ও দেবী, গুরুর আদেশেই আমি একরাত্রি সহ-বাস করতে গিছলাম। ও আমাকে সরিয়ে দিয়েছে, বলেছে, "ছিঃ যে পথে যাচ্ছ সেই পথেই এগিয়ে যাও, এদিকে আর চেয়ো না। আমার দৈহিক সুখ আর সম্ভব নয়, তুমি কাছে থাকবে, সেই আমার যথেষ্ট।"

'গুরুই এখানে থাকার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। যত দিন আমি প্রাথমিক তপস্যায় ছিলাম, এখানেই এক আখড়ার মোহান্ত ওর সব খরচ চালি-য়েছে। অবশ্য খরচ আর কী, জীবনধারণের মতো সামান্য খাদ্য, আর বছরে বোধহয় একখানা কাপড় এই ওর লাগে। এখন সেটুকু আমিই ভিক্ষা করে এনে দিই গুরুজীর আদেশ মতো।'

'তা আপনি থাকেন কোথায়?'

'এই পাহাড়েরই কোথাও, খোলা জায়গাতেই থাকি, কিংবা নদীর তীরে। তিন ঘণ্টা বিশ্রাম নিই, তা সে যে কোনো জায়গায় শুলেই চলে। আস্তানা পেতাম বৈকি, ইচ্ছে করেই নিই নি।'

কথা হতে হতেই দেখি সেই বুড়ি একটা পাতায় করে ওঁর খাবার নিয়ে এলো, দিন-রাতের আহার্য। একখানা মাঝারি রুটি, আর একটু আলু সিদ্ধ। সাধুজী উঠে আর একবার হাত পা ধুয়ে সেই খাদ্যই বোধহয় তাঁর ইষ্টকে নিবেদন করে আহারে প্রবৃত্ত হলেন।

সন্ন্যাসের শুরু

বছর তিনেক আগের কথা। তুন এক্‌সপ্রেস তখন রাত দশটা নাগাদ হাওড়া ছাড়ে, কি আরও কিছু পরে।

এ ট্রেনে ভিড় হবে সে তো জানা-কথাই। প্ল্যাটফর্ম এমনিতেই জনারণ্য, তার ওপর কুলিটি যেখানে মাল নিয়ে গিয়ে নামাল—সেখানটা আরও, বলা যায় নিশ্ছিদ্র ভিড়। মাল নামাবার জায়গা মেলে না, নিজেরই স্থির থাকা মুশকিল। ঠেলাঠেলি ধাক্কাধাক্কি, কালীঘাটের মতো অবস্থা।

একটু পরে মনে হলো সেখানে একটা কি জটলার মতো চলছে। আর সেটা ঠিক সাধারণ যাত্রীদের নয়—সুবেশ নরনারীর সমাবেশই বেশির ভাগ। মহিলাদের দামী শাড়ি ও মূল্যবান অলঙ্কারের চাকচিক্যের সঙ্গে একটা ভক্তিগদ্‌গদ ভাবের প্রতিযোগিতা—সেই সঙ্গে সাহেবী পোশাক পরা কিছু অফিসার-ডাক্তার-উকিল বা বড় ব্যবসাদার গোছের পুরুষদের ঈষৎ দূরে থেকে দাম্পত্য শান্তি বজায় রাখার চেষ্টা—এসব দেখে মনে হলো এর সঙ্গে কোনো মহাপুরুষের যোগাযোগ আছে।

কৌতূহল হ'তে একটু এগিয়ে উঁকি মেরে দেখি, ঠিক তাই। সেই জটলার কেন্দ্রবিন্দুতে একখানা চেয়ারে বসে আছেন এক সাধু—অন্ততঃ তাঁর সিল্কের বহির্বাস ও চাদর—দীর্ঘ কেশ, কাঁচাপাকা দাড়ি-গোঁফে তাই বোঝায়; তাঁর পিছনে পাশে দাঁড়িয়ে তিন-চারজন ধনী গৃহিণী গলদ্‌ঘর্ম হয়ে পাখার বাতাস করছেন, বাকি অনেকেই কৃতাঞ্জলিপুটে ঘিরে দাঁড়িয়ে: চেয়ারের হাতায় ফুলের মালার স্তূপ।

গুরুদেব স্মিত প্রসন্ন মুখে মৃদু কণ্ঠে কী সব বলছেন—শিষ্যারা উৎকণ্ঠ হয়ে শুনে ব্যগ্র কৃতার্থ ভাবে তার উত্তর দিচ্ছে। কানে গেল এক বৃদ্ধা মহিলা বলছেন, 'আপনি যখন যাচ্ছেন বাবা, উৎসবের কোনো অঙ্গহানি হবে না, সব ঠিক যোগাড় হয়ে যাবে।'

গুরুদেব হাসি হাসি মুখে বললেন, 'আর আমি যদি না থাকি? উৎসব

হবে না ? তোরা পারবি না চালাতে ? তবে এতদিন কি শেখালুম !'

বৃদ্ধা বেশ গুছিয়ে বলতে গেলেন, 'বাবা আমরা হলুম যন্ত্র, আপনি যন্ত্রী, আপনি ছাড়া এত বড় কাজ—' কিন্তু কথা শেষ হবার আগেই প্ল্যাটফর্মে গাড়ি এসে গেল। প্রচণ্ডতর ঠেলাঠেলি চেঁচামেচি, দেখলে মনে হয় গাড়িতে আগে ওঠার ওপরই এদের জীবনমরণ নির্ভর করছে।

আমার এযাত্রা ফার্স্ট ক্লাসের টিকিট, চার্ট মিলিয়ে একটা কামরায় উঠলুম কিন্তু প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই দেখি ষাঁড়াষাঁড়ির বানের মতো সেই দলটি এই বগির ওপরই আছড়ে পড়ল।

উঃ—সে কী প্রচণ্ড গোলমাল! প্রায় সবাই অপর সবাইকে নির্দেশ দিচ্ছে, কোন্ মাল কোথায় রাখা হবে, কে কোন্ কামরায় যাবে—তা নিয়ে মতভেদের অন্ত নেই। দেখলাম গুরুদেব একা নন—বেশ একদল শিষ্যশিষ্যাও যাচ্ছেন। কথাবার্তায় ভাঙা টুকরো থেকে যা বোঝা গেল, কোন্ আশ্রমে কিছু উৎসব আছে, সেই উপলক্ষেই যাচ্ছেন এঁরা। তারই প্রচুর উপকরণ সঙ্গে যাচ্ছে—ফল মিষ্টি আনাজ, হ্যাজাগ আলো থেকে কলাপাতার বস্তা পর্যন্ত—কিছু বাকি নেই।

মনটা তিক্ত হয়ে উঠল। এই হট্টগোল সঙ্গে সঙ্গে যাবে—সারাটা পথ—সে যে সাংঘাতিক কথা। এ অভিজ্ঞতা আগেও একবার হয়েছে—জানি তো, স্টেশনে স্টেশনে ভক্তদের আগমন আর ভক্তির প্রতিযোগিতা—গুরুর তো জীবনান্ত বটেই, গাড়ির অন্য যাত্রীদেরও প্রাণান্ত।

সৌভাগ্যক্রমে আমার কামরায় অন্য যাত্রী ছিল না। চার্টে নাম আছে, বোধহয় বর্ধমান কি আসানসোল থেকে উঠবে। তা হোক—আপাততঃ তো একটু শান্তি।

বিছানা পেতে জামা প্যান্ট খুলে সবে একটু আরাম ক'রে বসেছি, ট্রেন ছাড়ার পর কোলাহলটাও একটু থিতিয়ে এসেছে—হঠাৎ দরজার কাছে দেখি সেই সাধুটির আবির্ভাব।

'একটু আসতে পারি ?' প্রসন্ন প্রশান্ত মুখ, দেখলে সম্ভ্রমবোধ হয় তাতে সন্দেহ নেই।

'আসুন আসুন' ব্যস্ত হয়েই বলি, 'গাড়ি তো খালিই—'

সাধু ভেতরে এসে সাবধানে দরজাটা টেনে দিলেন, তারপর সামনের বার্থে বসে পড়ে দামী সিগারেটের প্যাকেট বার করে একটা আমার দিকে এগিয়ে নিজেও একটা ধরালেন।

এর পর—কোথায় যাব, কি করি ইত্যাদি দু-একটা খুচরো প্রশ্নের পর হঠাৎ গলাটা নামিয়ে বললেন, 'বাবা, এভাবে হঠাৎ আপনাকে পাওয়া আমার কাছে ভগবানেরই যোগাযোগ মনে হচ্ছে।...একটা বড্ড দায়ে ঠেকেছি। মোটামুটি আমার সঙ্গে আপনার স্ট্যাচারের মিল আছে।... আপনার কাছে বাড়তি একসেট জামা কাপড় হবে বাবা ? ধুতি পাঞ্জাবি হলেই ভালো হয়—নিদেন প্যাণ্ট শার্ট? আপনি যে দাম বলবেন আমি তাই দেব, আপনি আবার করিয়ে নেবেন—'

'তার মানে ?'—বিহ্বল কণ্ঠে প্রশ্ন করি। প্রস্তাবটা ঠিক কী—বুঝতেই দেরি হয়। নানা রকম অস্পষ্ট সন্দেহ মনে উঁকি মারে।

'বলছি বাবা, খুলেই বলছি। নইলে আপনি বুঝবেনই বা কেমন ক'রে। আসলে কি জানেন, আমি এবার সন্ন্যাস নিতে চাই। সত্যিকারের সন্ন্যাস। কিন্তু সে—এই নিজেরই তৈরী জাল ছিঁড়তে না পারলে তো হবে না! আর—এই পোশাকে এ চেহারায় পালিয়ে কতদূর যাব ?'

'কিন্তু—' আরও যেন ঘুলিয়ে যায় মাথাটা, 'আপনি কি সন্ন্যাসী নন ?'

'না। আর মিথ্যা বলব না। ঠিক করেছি আজই শেষ করব যাত্রার এ গাওনা। এ আমার সন্ন্যাসীর সাজ। আমি ব্রাহ্মণ, গুরুবংশের ছেলে, দেশে জমিজমা ছিল, তাই বাবা যখন বিয়ে দিলেন, সুপাত্রীর অভাব হয় নি। সুন্দরী বৌ, বি. এ. পাস, ভালো গাইতে পারে—এসে জুটল আমার ঘরে—যে আমি ম্যাট্রিকের ওপারে যেতে পারি নি। কিছু কিছু সংস্কৃত পড়েছিলুম এক পণ্ডিতের কাছে, সেও বলার মতো কিছু নয়।

'তা মিছে বলব না, বৌ হয়ত মনে মনে একটু ক্ষুণ্ণ হয়েছিল—তবে আমাকে অযত্ন কি অবহেলা করে নি। বাপের পয়সার অভাবেই তাকে এ ঘরে এসে পড়তে হয়েছিল—তবে, সে স্পষ্টই বলত, মাতাল গেঁজেলের হাতে যে পড়ি নি, কিংবা দোজবরে—এই তো আমার ঢের।

'বছর তিন-চার বেশ কেটেছিল বাবা, একটি ছেলেও হয়েছিল, ফুট-

ফুটে। কিন্তু হঠাৎ বাবা মারা যেতে—মা আগেই গিছলেন—চোখে অন্ধকার দেখলুম। জমিজমার আয় যা, তাতে সচ্ছলে চলে না—গুরু-গিরির আয়টাও কমে গেল হঠাৎ। এখানকার লোক কেউ কুলগুরু পছন্দ করে না, সবাই মহাপুরুষ ধরতে চায়। আগে যে সব শিষ্যরা বাবাকে বার্ষিক পাঠাত, তারা হাত বন্ধ করলে। এধারে সকলেই বলতে লাগল—আমার ছেলেটার মাথা নাকি খুব সাফ, ভালো ভাবে পড়ালে একটা মানুষের মতো মানুষ হবে। কিন্তু সে পয়সা কই? আমার স্ত্রী আড়ালে কাঁদেন আর সামনে নিঃশ্বেস ফেলেন। আমি কি করব তা কিছুই ভেবে পাই না।

'এই যখন অবস্থা, একদিন কলকাতায় ঘুরতে ঘুরতে আমার এক বাল্য-বন্ধুর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। ছোটবেলায় একটা ছেলেকে গোবেড়েন দিয়ে তার হাত ভেঙে দিয়েছিল। ঘরে বাইরে মার খাবার ভয়ে সেই দিনই উধাও হয়ে যায়। বছর ছ-সাত পরে দেশের এক ভদ্রলোকের সঙ্গে ক্যানাডায় দেখা হয়েছিল, শোনা গেল, সেখানে কী ব্যবসা ফেঁদে বসে বেশ দু-পয়সা কামাচ্ছে। সেই যা খবর পাওয়া গিছল—একে-বারে এই দেখা। রঘু নাম—চেহারা পোশাক গাড়ি দেখে বুঝলুম এখানেও ভালো রোজগার করে। কী জানি কি হলো তার, আমাকে দেখে জড়িয়ে ধরল। বাড়ি নিয়ে গিয়ে খুব খাওয়াল। রঘুর সব কাজই তড়িঘড়ি—আমার অবস্থার কথা শুনে বললে, এই গুরুগিরি করবি? ছাখ্, ভালো বিজনেস। খরচ-খরচা পাব্লিসিটি সব আমার—লাভের আধাআধি চাই।

'বললুম, দূর, আমি তো বর্ন-গুরু—কিন্তু এখন কেউ পোঁছে না।'

'রঘু বললো, ফুঃ। ওসব গুরুর কাল চলে গেছে। মডার্ন গুরু চাই। সে তুই বুঝবি না। যা করবার আমি করব—তুই শুধু দুটো হেঁয়ালি হেঁয়ালি ধম্মকথা আওড়াতে পারবি তো? বই চাস—দু-পাঁচশো টাকার বই আনিয়ে দেবো, চেহারা ভালো আছে—লেগে যাবে।

'তা বাবা, খেল দেখাল বটে রঘু। নিজের বাড়িতে রেখে এই সব সাজ-পোশাকে সাজিয়ে রটিয়ে দিলে, এক সিদ্ধ মহাপুরুষ হিমালয়ে সাধনা

করতেন, জনসমাজে আসতে চান না—সে জোর করে ধরে এনেছে! ব্যস, আর যায় কোথায়। বড়লোকের বড়লোক বন্ধু সব—পিলপিল করে আসতে লাগল। পসার জমে উঠল দেখতে দেখতে। পাঁচ-ছটা আশ্রম হয়ে গেল দু বছরের মধ্যে। রঘু পাকা ব্যবসাদার, হিসেব ক'রে আয়ের অর্ধেক নিজে রেখে—বাকি টাকা থেকে নিজের নামে আমার স্ত্রীর কাছে টাকা পাঠাতে লাগল। তাকে জানাল যে আমি দুর্গম পাহাড়ে তপস্যা করতে গেছি, ওকে বলে গেছি সংসারটা দেখতে। ঈশ্বরের ইচ্ছেয় ওর অভাব নেই, আর আমি ওর প্রিয় বন্ধু, এটা ও তার দায়িত্ব বলে মনে করে।

'না, সেদিক দিয়ে আমি নিশ্চিন্ত। ছেলে ভালো লেখাপড়া শিখে বিলেত গেছে। সেখানেই এক কোটিপতি গুজরাটির মেয়ে বিয়ে করে বাসা বেঁধেছে। স্ত্রীও বছর পাঁচেক দেখে 'স্বামী ত্যাগ করে গেছেন' এই কারণ দেখিয়ে ডিভোর্স নিয়ে এক মিউজিক ডিরেক্টারকে বিয়ে করেছেন। সেজন্যে আমার কোনো ক্ষোভ নেই, আমি খুব খুশী। তিনিও ভালো আছেন, মাত্র দিন সাতেক আগে তাঁকে দেখেওছি—রূপে রসে বেশ ঝলমল করছেন এখনও।

'এক কথায়—এদিকের কাজ শেষ। এখনও আর এ জুচ্চুরি, এ অভিনয় করতে মন সায় দেয় না। মনে হয় যার নকলেই এই—তার আসলে না জানি আরও কী, আরও কত আছে। সেই পরমানন্দ, সেই পরমবিভূতি—ধারণাতীত ঐশ্বর্যের জন্যে মনটা লালায়িত হয়েছে।...কিন্তু এমনই জাল বিস্তার করেছি যে, আমি ছাড়তে চাইলেও কম্‌লী ছাড়বে না। আমি এ ঠাট ছেড়ে যেতে চাইছি শুনলে আরও বড় মহাপুরুষ ভাববে, আরও বেশী করে আঁকড়ে ধরবে। তাই ঠিক করেছি—এবার পালাব। পালাতেই হবে। এক কাপড়ে, একা। সৎ গুরুর সন্ধানে যাব—ভিক্ষা করতে করতে—যিনি সে আনন্দের স্বাদ দেওয়াতে পারবেন। সেই জন্যেই এই সাহায্যটুকু চাইছি।'

দিলাম একসেট ধুতি পাঞ্জাবি বার করে। টাকা বার করেছিলেন—

নিই নি। লোকটিকে ভালো লেগে গিছল। ওঁর নির্দেশেই বর্ধমান ছাড়বার পর একটা বাথরুমে রেখে এসেছিলুম সেগুলো, সেই সঙ্গে আমার ক্ষুর আর কাঁচি। অত বড় দাড়ি আগে ছেঁটে না নিলে কামানো যাবে না। রাত তিনটেয় একবার বাথরুম যাবার সময় বেরিয়ে দেখি ভদ্রলোক স্থির হয়ে করিডরে দাঁড়িয়ে আছেন। ইতিমধ্যে তাঁর দাড়ি-গোঁফ কামানো হয়ে গেছে। নিঃশব্দে ক্ষুর আর কাঁচি ফেরত দিয়ে একটু হাসলেন—আনন্দ উত্তেজনা কৃতজ্ঞতা মেশানো বিচিত্র হাসি।

ভোরবেলা সাসারামে পৌঁছে একটা চেঁচামেচিতে ঘুম ভাঙল।

ওঁর শিষ্য-শিষ্যারা হাহাকার করছেন। বাবা নাকি অন্তর্ধান করেছেন। তাঁর কৌপীন্ বহির্বাস চাদর মায় জুতো সিগারেটের কেস সব পড়ে আছে, তাঁর চিহ্ন নেই। ফলে আরও বড় হয়ে গেলেন তিনি। এই ভাবে সশরীরে অন্তর্ধান করায় মহামানবত্ব নয়, পুরোপুরি দেবত্বই প্রমাণ হয়ে গেল। এত হাতের কাছে পেয়েও তারা চিনতে পারে নি—হাহাকার আরও সেই জন্যেই।

সাধু নয়, সাধক নয়

যতীশ্বর স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়েই রইলেন। সে জড়বৎ অবস্থা তাঁর মস্তিষ্কেরও, কোনো চিন্তাশক্তিই কাজ করছে না। কী হ'চ্ছে তাঁর চারপাশে তাঁকে ঘিরে—কেন এরা এমন করছে কিছুই বুঝছেন না। এমন কি এই যে অসংখ্য নরনারী তাঁর পায়ের ওপর প্রায় আছড়ে পড়েছে, কেউ বা তাঁর পায়ের আঙুলগুলি লেহন করছে, কেউ বা পায়ে মুখ ঘষছে, একটি তরুণী রমণী তো তাঁর একটা হাঁটু বুকে চেপে ধরে হাউ হাউ করে কেঁদে যাচ্ছে। এ কান্না দুঃখের নয়, ভক্তির বিস্ময়ের। অলৌকিক শক্তি দর্শনের ফল। তবে এসব বিচার করারও ক্ষমতা নেই যতীশ্বরের—বিমূঢ় পাথর হয়ে গেছেন তিনি।

আসলে কি যে ঘটল, কেন ঘটল সেটাই যে তাঁর মাথায় যাচ্ছে না। তিনি তো বোধহয় সব ঘটনাটা জানেনও না।

এমন তিনি আশা করেন নি বললেও ভুল বলা হবে, ধারণা কি কল্পনাতেও ছিল না এটা—এই যে আশ্চর্য ঘটনা ঘটে গেল। আর সে ঘটে গেল নাকি তাঁরই তপস্যার বলে।

যতীশ্বর ধনীপুত্র। শোনা যায় তাঁর বাবা একদা বহু দুঃখে লেখাপড়া শিখেছিলেন। বহু লড়াই করতে হয়েছে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হবার জন্যে। তবে সে পুরাতত্ত্ব ওঁর কাছে, ওঁরও জন্মের বহু পূর্বের ঘটনা। লেখাপড়ার জোরেই স্কলারশিপ নিয়ে বিলেত গিছলেন, ফিরে এলেন ব্যারিষ্টার হয়ে। পয়সার দুঃখ পেয়েছেন বলেই বিদ্যার থেকে অর্থের দিকেই আকৃষ্ট হয়েছিলেন বেশী। এবং যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী, এই মহাবাক্যের যাথার্থ্যও তিনি প্রমাণ করে দিয়েছিলেন। বিপুল বিত্ত উপার্জন করেছেন তিনি, লক্ষ লক্ষ টাকা। শেষে তো এমন হয়েছিল—তখনকার দিনেই, একবার দাঁড়ালে আড়াই হাজার টাকা পেতেন;

মামলা করা চলবে কিনা, কাগজ-পত্র দেখে এই অভিমত দিতেই একশো গিনি বা সতেরশো টাকা চার্জ করতেন।

অর্থ এলেই অনর্থ আসবে এটা স্বাভাবিক। বড় ছেলের বিয়ে দিয়েছিলেন তিনি এক ধনী শিল্পপতির কন্যার সঙ্গে, তাদের বাড়ি বাপ মা ছেলে মেয়ে ডিনারের শেষে একত্রে মদ্যপান করত। তার সঙ্গে ছেলের বনে নি, নিত্য ঝগড়া, শেষে বৌ ছুঁড়েছিল জুতো, ছেলে চাবুকের বাড়ি মেরেছিল—দু'জনে দু'দিকে চলে যায়। যতীশ্বরের সে বৌদিকে যতী নিজের চোখে রাস্তায় মাতলামি করতে দেখেছে, ইটালিয়ান সেলারের সঙ্গে গড়ের মাঠের নিভৃত অংশে যেতেও।

কেউ সুখী হয় নি ওরা—ভাই বোনেরা। তার মূলে ঐ অর্থেরই প্রাচুর্য। মেজভাই বিলেতে গিছল ব্যারিষ্টারী পড়তে, সেটা হয়ে ওঠে নি, যা হয়েছে পাঁড় মাতাল, এক রেস্তোরাঁর ওয়েট্রেসকে বিয়ে করে ফিরেছে। বাবা তাদের আলাদা বাড়ি করে দিয়ে মাসে হাজার টাকা খরচা দিতেন, তাতে কি হবে, সে স্ত্রীটি বেশ কিছু হাতিয়ে নিয়ে একদা বিলেতে পাড়ি দিল। অতিরিক্ত সুরাপানের ফলে ছেলে একেবারে অকর্মন্য হয়ে গেছে। কোথায় যেন কোনো বিদেশের এক নিকৃষ্ট হোটেলে পড়ে থাকে, বাবা কিছু টাকা আমানত করে দিয়েছিলেন ওর নামে—যাতে মাসে দুশো টাকার বেশী না পায়।

এমনি অবস্থা ভাই বোন সকলেরই। সকলেই অসুখী। নানা কেলেঙ্কারী আর দুর্নাম—সবকটি ভাই-বোনেরই, যতী ছাড়া। যতীকে মেধাবী আর ভদ্র দেখে বাবা শেষ আশা হিসেবে বিলেতে পাঠিয়ে ছিলেন, ব্যারিষ্টার হয়ে এসে তাঁর এই সুনাম কিছুটা বজায় রাখতে পারবে বলে। পাস করেই এসেছিল যতী কিন্তু যখন ফিরে এলো তখন ওর মা মারা গেছেন, আর বাবা সেই শোকে, দুঃখের সময়ের সঙ্গিনী স্ত্রীকে হারিয়েও বটে, ছেলেমেয়েদের জীবনগুলো তাঁর চোখের সামনে নষ্ট হয়ে যেতে দেখে—বিশেষ পরিবারের বিভিন্ন বিচিত্র দুর্নামে, নিজে ক্রমশ বিদ্রূপ ও অবজ্ঞার পাত্র হয়ে উঠছেন দেখে—মদ ধরেছিলেন। যে শক্তিমান সে সর্বদিকেই এগিয়ে যাবে—দেখতে দেখতে পাঁড় মাতাল হয়ে

উঠলেন। উপার্জন বন্ধ হলো, আর সেই অবসরে বড় ও সেজ ছেলে মিলে নানা স্পেকুলেশ্যনে বিপুল পৈতৃক বিত্ত শেষ করে আনল। যতী যখন এলো তখন এই একটি বাড়ি ছাড়া কিছু নেই, বাবার সেরিব্রাল স্ট্রোক হয়ে পক্ষাঘাতে শয্যাগত।

সব শুনে ও দেখে, অর্থে ও আভিজাত্যে একটা প্রবল ঘৃণা এসে গেল যতীশ্বরের। সৌভাগ্যবশত ওর আসার দিন-কয়েক পরেই বাবা মারা গেলেন। শ্রাদ্ধ-শান্তির পর শেষ বসত বাড়িটি বেচে (প্রকাণ্ড বাড়ি) যা পাওয়া গেল, তা থেকে দেনা শোধ করে এক এক ভাইয়ের ভাগে হাজার সাতেক করে টাকা জুটল। তার সবটাই তিনি একটি পুরনো চাকরের হাতে দিয়ে পুরী চলে এলেন।

ইচ্ছা ছিল শুধু জীবনধারণের মতো কিছু কিছু ভিক্ষা করে তপস্যা করবেন। কিন্তু যে চাকরটিকে টাকা দিয়েছিলেন, সে যথার্থ ভদ্রলোক এবং 'সাহেব' শ্রেণীর লোক নয় বলেই সম্ভবত, সেই টাকায় একটা বেনেতী মশলার দোকান খুলেছিল। কিছুদিন পর থেকে প্রতি মাসে যতীশ্বরকে পঞ্চাশটি করে টাকা পাঠিয়ে যাচ্ছে। সে নাকি তার ছেলে-কেও দিব্যি গেলে এই ভার দিয়ে রেখেছে, যাতে মরবার পরও ঐ মাসোহারা বন্ধ না হয়।

সুতরাং ভিক্ষাটা বেঁচেছে। সমুদ্রের ধারে অথচ শহরের একপ্রান্তে দশ টাকা দিয়ে একটি ঘর ভাড়া করে আছেন যতীশ্বর গত প্রায় ন' বছর। একবেলা দুটি ভাত ফুটিয়ে নেন, তাতেই যে-কোনো একটা আনাজ ফেলে দেন—শেষের দিকে ভাতের মধ্যেই এক চিমটি নুন ফেলে দিয়ে ফ্যান সুদ্ধ নামিয়ে নেন—সবটা একসঙ্গে চটকে পিণ্ডির মতো করে খান। কদাচ কখনও কাপড়ের দরকার হয় বটে—তবে সেই মশলার দোকানীই হিসেব করে পুজোর সময় এক জোড়া কাপড় পাঠায় আর দুটো গেঞ্জি। আর কিছুর দরকারও হয় না। এখানের একটি স্থানীয় লোকই তাঁর মৃত ছেলের একটি সোয়েটার আর একটা ফ্ল্যানেলের জামা দিয়েছে, একরকম জোর করেই—শীত তাতেই কেটে যায়। সেও বিশেষ দরকার হয় না।

আশেপাশে দরিদ্র লোকের বাসই বেশী, গঞ্জামের ঝুলিয়া। দু'চার ঘর আদিবাসী উড়িয়াও আছে, এদেরই একজন গোরু মোষ পুষেছে, শহরে নানাবিধ দ্রব্যের মিক্স্চার করে দুধ যোগান দেয়। সেই লোকটিই মধ্যে মধ্যে—অবিক্রীত থাকলে, এক আধটু দুধ দিয়ে যায়—সেটা অবশ্য খাঁটি দুধই, কখনও বা ছানা কি ক্ষীরও দেয়। তবে সে দৈবাৎ, কদাচিৎ, আট দশদিন অন্তর। এতে যতীশ্বর 'না' বলেন না—ভিক্ষা হিসেবে গ্রহণ করেন। তনু রক্ষার জন্যে এটুকু পুষ্টি প্রয়োজন। দুধ পেলে দুধেই ভাত মেখে খান।

আর রসনার তৃপ্তি হয় মধ্যে মধ্যে—ওঁর বাবার আমলের পাণ্ডা, অবস্থা দেখে, এদিকে কেউ ছড়িদার এলে কিছু কিছু প্রসাদ পাঠিয়ে দেন, কখনও বা মিষ্টি প্রসাদ, কখনও বা অন্ন। সেদিনটা ওঁর কাছে ভোজের দিন।

তাই বলে যতীশ্বর সন্ন্যাসও নেন নি। গেরুয়া কাপড় পরেন না। দীক্ষাও নেন নি কারও কাছে। তেমন কোনো প্রবল ইচ্ছাও অনুভব করেন নি কখনও। আপত্তি নেই, তবে কেমন মনে হয়—সময় হলে গুরু নিজেই দেখা দেবেন বা কাছে টেনে নেবেন।

প্রশ্ন, তাহলে কি করেন?

তপস্যা কাকে বলে তা তিনি জানেন না, যোগ কেমন করে করতে হয় তাই বা শেখাবে কে? কোনো বই নিয়ে আসেন নি, এখানে এসে বই কিনবেন, সে সামর্থ্য নেই।

শুধুই বসে বসে ভগবানের কথা ভাববার চেষ্টা করেন। আর প্রত্যূষে, দ্বিপ্রহরে, সন্ধ্যায় নাম জপ করেন। কোন্ নাম পছন্দ তাও যেন ভেবে পান না, শেষ পর্যন্ত হরিনামই জপ করেন। কোনো কোনো দিন মনের মধ্যে আকর্ষণ বোধ করলে জগন্নাথের মন্দিরে যান, নয়তো টোটা গোপীনাথে। জায়গাটা নির্জন বলেই ভালো লাগে। এই জপ শুয়ে শুয়েও চলে। জপ করতে করতে ঘুম পেলে ঘুমিয়ে পড়েন, জোর করে জেগে থাকার চেষ্টা করেন না।

এতে ব্রহ্মের কাছে পৌঁছচ্ছেন কিনা, কোনো দিন পৌঁছনো যাবে কিনা—তাও ভেবে দেখেন নি। তবে মনে বেশ একটা আরামদায়ক শান্তি অনুভব করেন—এইটুকুই তাঁর লাভ। আর বিগত পারিবারিক জীবনের ক্লেদ অনেকটা ভুলেছেন, সেটাই মনে হয় এই দীন জীবনের প্রত্যক্ষ পুরস্কার।

বাইরের হাওয়া এসে পৌঁছয় বৈকি মধ্যে মধ্যে।

বছরে এক আধবার বাড়িওলা আসেন। তিনি রাজনৈতিক অবস্থার সংবাদ দেন। যে গয়লা-গিন্নী দুধ দিতে আসে মধ্যে মধ্যে, সেও দেয়—সত্যে গুজবে মেশানো। দশ বারো দিন অন্তর কোনো ছড়িদার আসে প্রসাদ নিয়ে—সেও 'বাবু শুনিলা, কলিকাতার হালচালঅ?' বলে সংবাদ পরিবেশনের চেষ্টা করে। এই সময়টা বড় অশান্তি বোধ করেন। ঠিক যে বিতৃষ্ণা কি গ্লানি অনুভব করেন তা নয়, তবে এসব সংবাদ তাঁর কাছে বহু দূরের এক নাগরিক জীবনের স্মৃতি বহন করে আনে—ইচ্ছার বিরুদ্ধে মন সেই সব চিন্তায় চলে যায়। অথচ কখনও কখনও যে শুনতে ইচ্ছাও করে তাও তো অস্বীকার করার উপায় নেই। আত্মপ্রবঞ্চনা তো আত্মহত্যারই সামিল।

তবু মোটামুটি যতীশ্বরের জীবনটা ছিল শান্ত, নিস্তরঙ্গ।

অকস্মাৎ কাল সন্ধ্যা থেকে এই বিপুল আবর্তন ও আলোড়ন দেখা দিয়েছে। ঠিক এই ধরনের কোনো ঘটনার জন্যে তিনি প্রস্তুত ছিলেন না। অভাবনীয়, অকল্পনীয়—এখনও পর্যন্ত অবোধ্য।

কদিন আগেই খবরটা শুনেছেন। কী একটা রোগ এসেছে শিশুদের, খুব জ্বর হচ্ছে, চোখ মুখ লাল হয়ে উঠে মাথা চালছে তারপর অজ্ঞান হয়ে যাচ্ছে। সেই অবস্থায় দু'তিন দিন থেকে মারা যাচ্ছে। ডাক্তাররা কেউ বুঝতে পারছে না, কোনো চিকিৎসাও হচ্ছে না।

সেইসঙ্গে আরও একটি খবর পেয়েছেন—দূরে ঐ মল্লিকাবাস বলে যে বড় বাড়িটা আজ বছর তিনেক খালি পড়ে আছে, দরজা জানলা কিছু কিছু তো গেছেই, অর্ধেকটা বালির নিচে চাপা পড়েছে; না হলে নোনা

ধরে দেওয়ালও খসে পড়ত, সেই বাড়িই খানিকটা বসবাসযোগ্য করে বাড়িওলাদের কে এসেছে, বাকীটা সারিয়ে কোন্ কোম্পানীকে ভাড়া দেবে বলে।

বলা বাহুল্য দুই সংবাদেরই সরবরাহিকা গয়লা-গিন্নী।

খবর পেয়েছেন, ঐ পর্যন্তই। ওঁর সঙ্গে আর এ সবের সম্পর্ক নেই। এমন তো অসুখ মধ্যে মধ্যেই দেখা দেয়—যতদিন না তার ওষুধ বেরোয় বা রোগ নির্ণয় হয় ততদিন কিছু লোক মরে। তবে শিশু মরছে দেখলে মানুষ একটু বেশী বিচলিত হয়, অবোধ জীব, কী কষ্ট হচ্ছে বলতে পারে না বলেই আরও।

খবরটা শুনেছিলেন, ভুলেও গিয়েছিলেন। তাই যখন অকস্মাৎ গতকাল ঝড়ের মতো মেয়েটি এসে আছড়ে পড়ল ওঁর পায়ের কাছে, তখন প্রথমটা এ ঘটনার কার্যকারণ কিছুই বুঝতে পারেন নি।

হ্যারিকেনের আলো, তাও খুব উজ্জ্বল নয়—তবু মেয়েটির মুখের দিকে চেয়ে অবাক হয়ে গেলেন যতীশ্বর। তিনি ভারতের বহু স্থানে গেছেন, ইউরোপেও বড় বড় সব শহরই ঘুরেছেন প্রায়—কিন্তু সেই মুহূর্তে সেই আলো-আঁধারির মধ্যেও মনে হলো এমন সুন্দরী মেয়ে তিনি কোথাও দেখেন নি।

এমন সুন্দরী যে কেউ হতে পারে তা কোনোদিন ভাবেন নি, কল্পনাও করতে পারেন নি।

এ যেন স্বপ্নলোক থেকে নেমে আসা কেউ। অমরাবতীর কোনো কন্যা। হয়তো চোখের ভ্রম, হয়তো কোনো আত্মা ছলনা করতে এসেছে। আজ সারা দিনই শরীরটা খারাপ ছিল বলে কিছু খান নি বিশেষ—সেই উপবাসক্লিষ্ট দৃষ্টি আলো-আঁধারির মায়াতে বিভ্রান্ত হয়েছে।

তিনি শুনেছেন সন্ন্যাসীরা কঠোর তপস্যায় রত থাকলে আগে দেবতারা এমনি অলোকসামান্য রূপবতী পাঠাতেন তাদের তপস্যা ভঙ্গ করতে। তান্ত্রিক সাধকরা শ্মশানে আসন করে বসলে এইভাবে লোভ দেখানো হয়, কাকেও বা ভয় দেখিয়ে তাদের আসন পণ্ড করা হয়।

এও কি তেমনি কিছু?

কিন্তু তিনি তো সন্ন্যাসীও নন, সাধকও নন—তবে ?

আবারও ভালো করে চেয়ে দেখলেন। না মায়াময়ী নয়, তবে মোহময়ী অবশ্যই।

শিথিল কবরী কাঁধে এলিয়ে পড়েছে, বিশ্রস্ত শাড়ি, জামাও সুবিন্যস্ত নয়, ছুটে আসার ফলে ললাটে কপোলে বিন্দু বিন্দু ঘাম, উর্ধ্বোত্থিত কণ্ঠের খাঁজও চিকচিক করছে। ঘন ঘন নিশ্বাসে অর্ধ-অনাবৃত বক্ষ তোলপাড় করছে—তাতেও স্বেদার্দ্রতার ঔজ্জ্বল্য।

লণ্ডনে থাকতে বা পারী কি রোমে কিছু কিছু স্ত্রীলোকঘটিত অভিজ্ঞতা হয়েছে তাঁর। এই শ্রেণীর স্মৃতিই রিরংসাকে প্রবল করে তোলে।

মুহূর্তের জন্য মনটা দুলে উঠল বৈকি।

নির্জন ঘর, বাড়িও জনশূন্য। এদিকেই কেউ থাকে না। আধা অন্ধকার ঘর।

লোভকে প্রশ্রয় দেবার পক্ষে পরিবেশ ও অবস্থা উভয়ই অনুকূল।

মেয়েটি ওঁর স্থির দৃষ্টি দেখে বোধহয় একটু ভয় পেয়েই গিয়েছিল। সে এবার ওঁর দুই হাঁটু জড়িয়ে ধরে কী যেন বলবার চেষ্টা করল—

অপরূপা নারীদেহের চিত্র আরও স্পষ্ট। দেহের স্পর্শ অধিকতর উত্তেজক।

মুহূর্তে যেন স্থান কাল সব ভুলে গেলেন যতীশ্বর। ভুলে গেলেন এতদিনের বৈরাগ্য, জীবনের এই দিকটা সম্বন্ধে প্রবল বীতস্পৃহা। মনে হলো সমস্ত অন্তর এক বিরাট ভূমিকম্পে দুলে উঠল।

হে ঈশ্বর, হে ঈশ্বর—এ কি করলে!

ঈশ্বরকে স্মরণ করাতেই কি কাজ হলো ?

মেয়েটি বলে উঠল, 'বাবা আপনার পায়ে পড়ি, আমাকে রক্ষা করুন।'

বিরাট একটা নিশ্বাস ফেলে প্রাণপণ চেষ্টায় যেন প্রকৃতিস্থ হলেন।

সে কি স্বস্তির নিশ্বাস, না হতাশার, আশাভঙ্গের, নিরুদ্ধ কামনার ?

তারপরই বললেন, 'কি হয়েছে মা, আপনি অমন করবেন না। কি হয়েছে খুলে না বললে আমি যে কিছুই বুঝতে পারছি না।

এবার মেয়েটি কান্নায় ভেঙে পড়ল।

সেই কান্নার ফাঁকে ফাঁকে অসংলগ্ন কথার মধ্যে থেকে যা জানা গেল—সে ঐ মল্লিক বাড়ির বৌ, বঙ্কুবিহারী মল্লিকের পৌত্র ওর স্বামী। বেড়ানো ও বাড়ি সারানো দুই উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছে ওর স্বামী। হঠাৎ কাল থেকে খোকার জ্বর, আজ অজ্ঞান হয়ে গেছে। কী এক কালরোগ এসেছে নাকি, ডাক্তাররা বলছেন এর কোনো ওষুধ বেরোয় নি। রোগটা যে কি তা-ই তাঁরা বুঝতে পারছেন না।'

বলতে বলতে বৌটি হাউ হাউ করে কেঁদে উঠে যতীশ্বরের দুই পায়ের ওপর মাথা খুঁড়তে লাগল।

'আরে আরে, এ কি করছেন? শান্ত হোন। আমার কাছে কেন এসেছেন সেইটেই তো বলেন নি। এমনধারা আগে থেকেই ভেঙে পড়ছেন কেন। চুপ করুন। আমাকে কি করতে হবে তাই বলুন।'

'বাবা, শুনেছি আপনি খুব বড় সাধু। আপনি গিয়ে একটু ছেলেটার গায়ে মাথায় হাত দিন, তাহলেই আমার ছেলে সেরে উঠবে। দোহাই বাবা, বাঁচান আমার ছেলেটাকে।'

যতীশ্বর আরও ব্যস্ত ও বিব্রত হয়ে পড়লেন, 'না মা, আপনি ভুল শুনেছেন। বড্ড ভুল করছেন। আমি সাধু সাধক সন্ন্যাসী কিছুই নয়। আমি সন্ন্যাস নিই নি, এমন কি এখনও দীক্ষাও হয় নি। একা নির্জনবাস করি এই যা।'

মেয়েটা আরও ডুকরে কেঁদে উঠল, 'বাবা এমনভাবে আমাকে বঞ্চিত করবেন না। আপনি যে যথার্থ সাধু সে আমি আপনাকে দেখেই বুঝতে পারছি। আপনি গেলেই আমার ছেলে বেঁচে উঠবে।'

যতীশ্বর যত বোঝাবার চেষ্টা করেন যে, তিনি আদৌ সাধু নন—বরং বলা চলে ভণ্ড সন্ন্যাসী, সন্ন্যাসীবেশী বলা যায়—বৌটির—সোহিনী বুঝি নাম, ততই বিশ্বাস দৃঢ় হয় যে যতীশ্বর যথার্থ সাধু এবং তিনি গেলেই ওঁর ছেলে বাঁচবে।

অনেকক্ষণ বোঝাবার চেষ্টা করে শেষে যতীশ্বরকেই হাল ছাড়তে হলো। ততক্ষণে মল্লিকবাড়ি থেকে আরও একটি মেয়েছেলে এসে পড়েছে,

বোধহয় ঝি হবে, সেও অনুনয় বিনয় করতে লাগল।

বেশ তো সাধু যদি নাও হন, ভদ্দরলোক বামুনের ছেলে তো, একবার চলুনই না উনি, তাতে ওঁর কি অসুবিধা!

অগত্যা একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে যতীশ্বরকে যেতে হলো ওদের সঙ্গে। ওঁর কাছে কোনো তালাচাবি নেই, দরকার হয় না বলে, অনভ্যাসে কপাটটা বন্ধ করার কথাও মনে পড়ল না। ঝিটি ফিরে এসে কপাটে শিকল তুলে দিল। শিয়াল কুকুরও তো আসতে পারে।

ছেলেটিকে দেখে খুবই মায়া হলো ওঁর।

সুন্দর দেখতে, বিছানার ওপর নিথর হয়ে পড়ে আছে, যেন এক মুঠো ফুল। মুখটা অবশ্যই শুকনো, ভঙ্গিটাও নেতিয়ে পড়ার মতো।

যতীশ্বরের নিজেরই মমতা হলো ওকে দেখে—তিনি আর কোনো কথা না বলে একেবারেই পাশে বসে পড়লেন এবং ভগবানের নাম জপ করতে করতে আলতো হাত বুলোতে লাগলেন। একবার মনে মনে বললেন, "হে জগন্নাথ, একে বাঁচিয়ে দাও, এই নিষ্পাপ শিশুকে যেতে দিও না।"

সারারাত তেমনি বসে রইলেন যতীশ্বর। হাত বুলনো একসময় আপনিই বন্ধ হয়ে এলো, তবে হাত একেবারে সরিয়ে নিলেন না। ঠোঁট দুটি ঈষৎ নড়াতে বোঝা গেল নিরন্তর জপটা বন্ধ হয় নি—কিন্তু সবটা জড়িয়ে কেমন যেন একটা ট্রানস্‌-এর মতো অবস্থা। ধ্যানস্থ? না ধ্যানস্থ নয়, তন্দ্রাও নয়। চোখ দুটি অর্ধ-নিমীলিত—যেন কোন্ অতলে তলিয়ে গেছে মন, ইহ সংসার থেকে অনেক দূরে—মনের সীমাহীন গভীরে ডুব দিয়েছে।

একেবারে ভোরের দিকে শিশু চোখ খুলল। এদিকে চাইল একবার। খানিক পরে খুব আস্তে একবার ডাকলও, 'মা!'

চারিদিকে একটা অতি সতর্ক সাড়া পড়ে গেল। মানে কোলাহল না করবার চেষ্টা করে যতটা আনন্দ-চাঞ্চল্য প্রকাশ করা যায়।

এ রোগ যে সব শিশুদের হয়েছে তারা কেউ আর চোখ খোলে নি,

কথাও বলে নি। তবে কি এ বেঁচে উঠল সত্যিসত্যিই ? এই সাধুর কৃপায় ? সোহিনীর এই আকস্মিক চেষ্টা সফল হলো ?

পাছে সাধুর ধ্যানমগ্নতার ব্যাঘাত ঘটে—এজন্য সকলেরই চেষ্টা ছিল শান্ত ও নীরব থাকার। কিন্তু তা কি সম্ভব ?

সেই চাঞ্চল্যতেই যতীশ্বরের সম্বিৎ ফিরল। এবার তিনি চোখ খুলে ব্যাপারটা বুঝতেও পারলেন। তাহলে কি ঈশ্বর সত্যিই দয়া করলেন ? তিনি দু'হাত তুলে জগন্নাথের মন্দিরের উদ্দেশ্যে প্রণাম জানালেন। তারপর দ্রুত সে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে নিজের ঘরের পথ ধরলেন।

তার একটু পরেই এই সমবেত আক্রমণ। এই সামগ্রিক উন্মত্ততা। মাস্-হিস্টিরিয়া।

শিশুটির জ্ঞান ফিরেছে, সে কিছু খেয়েছেও। মার সঙ্গে কথাও বলছে। এ সবই কি ঐ সাধুর কৃপা বা শক্তির জন্যে সম্ভব হয় নি ? আশ্চর্য ! এ সিদ্ধ সাধক এতদিন এখানে আছেন, কেউ এর অলৌকিক শক্তির কোনো পরিচয়ই পায় নি, কেউ খোঁজও নেয় নি—ঐ গয়লা গিন্নী ছাড়া। তবে আর তারা এ ভুল করবে না, আর তারা ওঁর চরণ ছাড়বে না।···

উপস্থিত জনতার মধ্যেই কেউ কেউ প্রকৃতিস্থ হলেন।

বয়স্করা বকে-ঝকে কাউকে বা চড়চাপড় দিয়ে সরিয়ে দিলেন। আরে মানুষটাকে বাঁচতে দে, একটু নিশ্বাস নিতে দে। লোকটা তোদের ভক্তির অত্যাচারে মরে যাবে যে।

ক্রমে দুপুর নাগাদ লোকের ভিড় কমলো কিন্তু ফুলে মালায় বিভিন্ন বিচিত্র খাদ্যবস্তুতে যেন একটা পাহাড় জমে উঠল ঘরে ও ঘরের বাইরে। ধুতি উত্তরীয়ও যে কত এলো তার ইয়ত্তা নেই। স্বয়ং পূজারী পাণ্ডাও প্রসাদ নিয়ে ছুটে এলেন।

সকলে চলে যাবার পর একবার মাত্র উঠে ঈষৎ প্রসাদ নিয়ে মুখে দিলেন যতীশ্বর। বাকী সব তেমনি পড়ে থাকল। তিনি পূর্বের মতোই দূর ঝাউ-গাছটার দিকে চেয়ে স্থির হয়ে বসে রইলেন।

মনে মনে অতিশয় বিচলিত হয়েছেন বলেই বোধহয় বাইরে এই পাষাণ-

বৎ অবস্থা।

ওঁর যেন মনে একটা প্রবল আতঙ্ক দেখা দিয়েছে। মনে হচ্ছে এমন বিপদে আর কখনও পড়েন নি। কাল সন্ধ্যায় মনে হয়েছিল ভগবান ওঁকে পরীক্ষা করার জন্য নির্জন অবসরে বিস্রস্তবসনা ঐ সুন্দরী তরুণী মেয়েটিকে পাঠিয়েছিলেন। সে পরীক্ষায় তিনি উত্তীর্ণ হয়েছেন, আর কোনো ভয় নেই। কিন্তু আজ প্রত্যূষে শিশুটির আরোগ্যলাভের পর থেকে বুঝেছেন ওটা কোনো পরীক্ষাই নয়—আসল এইটা—প্রকৃতি অর্থে শক্তি নয়, অলৌকিক মানবোত্তর শক্তি দিয়ে পরীক্ষা করতে চাই-ছেন—ওই বৈরাগ্য বা ঈশ্বর চিন্তার প্রয়াস যথার্থ কিনা।

সে বিশ্বাস দৃঢ়মূল হয়েছে প্রভাতের ভক্ত সমাগমে—সকলের উন্মাদবৎ আচরণে।

এ বড় ভয়ঙ্কর নেশা। এই শক্তির—সাফল্য বলবেন না—এই ভক্তি-শ্রদ্ধা ও স্তুতির নেশা। এই যে এতগুলি লোক দেবতা বলে, কেউ বা সিদ্ধ সাধক বিশ্বাসে পুজো করছে—এর নেশা। এইতেই বহু সাধক বিনষ্ট হয়েছেন, বহুদিনের কৃচ্ছ্রসাধন তাঁদের ব্যর্থ হয়েছে। যথার্থ ঈশ্বরতিয়াসী বহুলোক মিথ্যাবাদী, মিথ্যাচারী ভণ্ড সন্ন্যাসীতে পরিণত হয়েছেন। প্রতিষ্ঠা রাখতে তিলমাত্র শক্তিকে তাল বলে প্রচার করতে হয়েছে।

অথচ কেন, কেন—তাকে নিয়ে ভগবানের এই খেলা। এই নিষ্ঠুর পরিহাস!

তিনি তো সন্ন্যাসী সাধক কিছুই হতে চান নি, কোথাও কারও কাছে প্রচার করেন নি নিজের এই চেষ্টা—শুধু একপ্রান্তে বসে ভগবানকে ভাববার চেষ্টা করেছেন। এটাই যে সাধনা বা তপস্যা হতে পারে—তা স্বপ্নেও ভাবেন নি। এমন কি সাধারণ দীক্ষাও নেন নি কারও কাছে, অপেক্ষা করে আছেন কোনো সদগুরুর দর্শন লাভের।

তবে? এত লোক থাকতে ওঁর দ্বারাই বা এ অঘটন ঘটাতে গেলেন কেন? তবে কি উনি ঈশ্বরের অনুকম্পা পেয়েছেন, তাই প্রলোভন দেখিয়ে পরীক্ষা করছেন তিনি?

সারাদিন গেল। অপরাহ্নের দিকে লক্ষ্য করলেন কিছু লোক এদিকে আসছে আবার। কারও হাতে মালা, কারও হাতে অন্য কোনো সেবার সামগ্রী।

যেন তড়িংপৃষ্টের মতোই লাফিয়ে উঠলেন যতীশ্বর।

সব ফেলে প্রায় ছুটে চলে গেলেন সমুদ্রতীরে—তারপর হন্‌হন্‌ করে একেবারে জলের কিনার ধরে হেঁটে চললেন, পশ্চিমপ্রান্তে যে বনরেখা দেখা যাচ্ছে সেই দিকে।

আর ফিরলেন না। কোনোদিনই না।

সময়ের হিসেবে নেই

দুই বন্ধু বেরিয়েছিলাম ভাগ্যান্বেষণে। সম্বলের মধ্যে ছিল দু'জনের দু'খানা ম্যাট্রিক সার্টিফিকেট আর বাড়ি-থেকে-হাতিয়ে-আনা শ'খানেকের মতো করে টাকা। 'মতো' বলার উদ্দেশ্য—আমার পুঁজি ছিল একশো'র কিছু কম, আমার বন্ধু শৌরীপদর সামান্য কিছু বেশী।

যে সময়ের কথা বলছি—তখন অবশ্য দুশো টাকা অনেক টাকা। তবু দুশো দুশোই, পাঁচ-সাতশো নয়। ট্রেন ভাড়া খাওয়া-দাওয়া—সামান্য কিছু এক্কা কি টাঙ্গা ভাড়া, জলখাবার—উপরন্তু এক-আধটা বিড়ি সিগারেট—দু-চার আনা করে যেতে যেতে সেই আপাত-বিপুল ঐশ্বর্য একসময় ফুরিয়ে এলো, কিন্তু দুই বন্ধু কারুরই ভাগ্যের তরী কোনো ঘাটে এনে ভেড়াতে পারলুম না। কাশী এলাহাবাদ লক্ষ্ণৌ দিল্লী—বড় বড় শহরের বড় বড় বাঙালী 'সাহেব'দের দোরে দোরে ঘুরে একটা কুড়ি টাকা মাইনের বেয়ারার চাকরিও জোটাতে পারা গেল না। শেষে, অবস্থা যখন সসেমিরে হয়ে দাঁড়াল—তখন একসময় প্রায় নিঃস্ব অবস্থায় এসে হরিদ্বার পৌঁছলুম।

হরিদ্বারে এসে ধর্মশালায় উঠেছি : ঘর ভাড়া লাগে না। পথের ধার থেকে সামান্য কিছু কিনে খাই আর লাজলজ্জার মাথা খেয়ে আবার বাড়িতেই ফিরব কিনা চিন্তা করি। ফেরা সাব্যস্ত করলেও গাড়ি ভাড়া আর অবশিষ্ট নেই। সেক্ষেত্রে হয় কালামুখ-নীল করে নিজেদের বাড়িতেই চিঠি লিখতে হবে, নয়তো সোজাসুজি এখানে ভিক্ষা করতে হবে। অথবা W. T.-তে মার খেতে খেতে ও গলাধাক্কা খেতে খেতে ফিরতে হবে। কোনোটাই খুব রুচিকর লাগছে না। দুই বন্ধুই অনেকগুলি ভাইয়ের একজন, কোনো বাড়িতেই কারও এমন অবস্থা বা টান নেই যে, অন্নজল ত্যাগ করে বসে আছে সবাই—চিঠি গেলেই টাকা এসে পড়বে। প্রায় অকূল অন্ধকারে ভাসছি, এমন সময় এক সন্ন্যাসী কিছু আলো

দেখালেন। হর-কি-প্যারী ঘাটে গিয়ে আলাপ হয়েছিল—বড় আখড়ার সাধু একজন, সেধেই আলাপ করেছিলেন বলতে গেলে। হিন্দীতেই কথা কইতেন, মধ্যে মধ্যে ভাঙা বাংলাতেও—কিন্তু কেমন যেন সন্দেহ হতো যে, এটাই ওঁর ছদ্মবেশ, বাংলা উনি ভালোই জানেন, হয়তো বাঙালী শরীরই ছিল এককালে।

সে যাক গে, মরুক গে—ওঁর যা উপদেশ তা সংক্ষেপে হলো এই যে, 'বেটা, সন্ন্যাসী বন্ যা!'

প্রথমটা অত বুঝতে পারি নি, এদেশী উচ্চারণ তত রপ্ত হয় নি তখনও। 'বেটা' শব্দের একারে অত্যধিক টান ও 'সন্‌ইয়াসী' উচ্চারণ, দুটোতেই সম্পূর্ণ অনভ্যস্ত—হাঁ করে চেয়েছিলুম, উনিই আবার ব্যাখ্যা করে বললেন, 'সাধু বন্ যা বেটা, তব কোই চিন্তা নেহি রহেগা!'

'ক্যয়সে মহাঁরাজ?' প্রশ্ন করলুম।

খুব খানিকটা হেসে নিলেন মহারাজ আপন মনেই, তারপর বুঝিয়ে বললেন ব্যাপারটা। সাধু বনে যাওয়া এমন কিছু কঠিন কাজ নয়। 'ধোতি আউর কুর্তা' গেরুয়া রঙে ছুপিয়ে নেওয়া, মাথাটা কামানো। হয় নামের আগে একটা ব্রহ্মচারী, নয়তো শেষে একটা আনন্দ জুড়ে দেওয়া। ব্যস—তারপর কোনো 'ছত্রে' নাম লিখিয়ে দাও, ভাত-দাল-রুটি তো দুবেলা মিলবেই—চাই কি 'দুধ আউর শক্কর'ও কিছু কিছু মিলতে পারে। তাছাড়া বহুত 'ভকৎ' মিলে যাবে, 'সিগ্রেট-তামাকু'র কোনো চিন্তা থাকবে না, 'চায়-কাফি'ও মিলতে পারে। আর বাস করার জন্য 'কুঠিয়া'—তারই বা অভাব কি?

আবারও হাসলেন খুব খানিকটা মহারাজ। যেন খুব মজা পেয়ে গেছেন মনে হলো। বললেন, 'তোমরা বাঙালী, তোমাদের তো এই এক মহা সুবিস্তা, মাথা কামিয়ে গেরুয়া পরলেই হলো। ছাই মাখতে হয় না, জটাও রাখতে হয় না। আমাদের কত অসুবিস্তা বলো তো!

ততক্ষণে আমাদের একটু ভরসা বেড়ে গেছে। গৌরীপদ বললে, 'তেমনি আরামও কত! ঘি চপ্‌চপে হালুয়া, দুধ বাদামের সরবৎ—'

'ওসব জমানা চলে গেছে বেটা, ওসব এখন কিস্‌সা—কহানী। এত

ঘিউ কোথা যে, চপ্‌চপে হালুয়া খাবে! দিচ্ছেই বা কে! কদাচিত কোনো ভক্‌ৎ দিলে তো মিলল। আমাদেরও ঐ দাল-রুটি দুধ-শক্কর—তবে আমাদের কোথাও যেতে হয় না, ঘরে বসেই মেলে—এই যা। আর কখনও-সখনও কোনো ভাণ্ডারা মিলল তো লাড্ডু কচৌরী রাবড়ির ইন্তিজাম হলো। তা সে তোমাদেরও হবে। ভাণ্ডারা হামেশাই মিলে ঋষিকেশে! বহুৎ ভক্‌ৎ আসে।'

কথাটা মনে লাগল। এখান থেকে বাড়িতে গাড়িভাড়া চেয়ে পাঠিয়ে 'হা-পিত্যেশ' করে বসে থাকার চেয়ে এ ঢের বেশী শ্রেয়। এর মধ্যে একটা সত্যিকার য়্যাড্‌ভেঞ্চার আছে তবু। দু-তিন দিন ভেবে স্থির করলুম এই পথই পথ!

চেপে ধরলুম সেই মহারাজকেই।

তাঁরও দেখলুম উৎসাহ খুব। কতকটা খেলার আনন্দ যেন তাঁর। 'মজা'। তিনিই গেরুয়া রঙে কাপড় ছুপিয়ে দিলেন, দু-তিন দিন হাঁটাহাঁটি করে সকালে একটা ও বিকেলে একটা ছত্র বা 'ক্ষেত্রে' ভিক্ষা অর্থাৎ আহারের ব্যবস্থা করে দিলেন—মায় এক 'ভক্‌ৎ'-কে বলে গঙ্গার ধারে দুটো 'কুঠিয়া' বা কুটিরের ব্যবস্থাও। কুঠিয়া অবশ্য নামে—আসলে পাকা ঘর। একজনের পক্ষে যথেষ্ট—এমন কি দু'জনেও থাকা চলে। ঐ একখানা ঘর পেলেও বেঁচে যেতুম, তবে দু'খানা ঘর যখন পাওয়া গেল তখন অবশ্য আর আপত্তি করলুম না। একটু হাত-পা ছড়িয়ে থাকা যাবে—মন্দ কি?

শুধু তাই নয়, মহারাজ আবার কোনো এক প্রতিষ্ঠানকে বলে দু'খানা করে কম্বল, দুটো বাড়তি বহির্বাস এবং সপ্তাহে আধসের চিনিরও ব্যবস্থা করে দিলেন। তার সঙ্গে মাসিক চা-পাতার বরাদ্দ। অভয় দিলেন যে, যদিও আর এতো ছুটোছুটি তাঁর পোষাবে না তবু ঐখানে বসেই, তিনি আমাদের বিড়ি-সিগারেটের খরচ চালাবার মতো একটা ব্যবস্থাও করতে পারবেন। হয়ত দশ-পনেরো দিন সময় লাগবে।

এরকম নিঃস্বার্থ পরোপকারী সাধু দেখতে পাব আশা করি নি। সত্যি-সত্যিই শেষদিনে যখন আমরা ঋষিকেশে পাকাপাকিভাবে বসলুম—

ওঁর সঙ্গে আর দেখা হবে না মনে করে চোখে জল এসে গিয়েছিল আমাদের দু'জনেরই।

তোফা দিন কাটতে লাগল। ভাবনা নেই, চিন্তা নেই—কাজকর্মও নেই। এত আরাম আশাই করি নি। কুটিয়াতে ইলেক্‌ট্রিক ছিল না, পাশেই এক 'হালওয়াই' অর্থাৎ ময়রা আমাদের একটা করে হ্যারিকেন দিয়েছিল ব্যবহার করতে—'মিট্টিকা তেল'ও সে-ই যোগাত।

শুনলুম যে প্রতিষ্ঠান এই কুটিয়াগুলি করে দিয়েছেন, তাঁরা চেষ্টা করছেন 'বিজ্‌লী আনিয়ে দেবারও—হয়ত তিন-চার মাসেই এসে যাবে। এমন এখানে আছেও, পনেরো বাতি পাওয়ারের বাল্‌ব্‌—কোথাও বা পঁচিশ, তাতে পড়াশুনো করা হয়তো যায় না, কিন্তু তার দরকারই বা কি, বাস করার পক্ষে ঐটুকুই যথেষ্ট; হ্যারিকেনের চেয়ে তো ভালো। পড়বার জন্যে তো সারাদিনই পড়ে আছে।

অন্য কোনো বাঙালী তরুণের ভালো লাগত না হয়তো—মাছ নেই মাংস নেই—সিনেমা দেখার সুযোগ-সুবিধা নেই। কিন্তু এছাড়া আর সবই ছিল। আমাদের বেশ লাগত। সকালে সিন্ধ্‌-পাঞ্জাব ছত্র থেকে দিত ছ'খানা করে রুটি, এক থাবা করে ভাত, একটা ডাল ও একটা সব্‌জি। রাত্রে আর এক জায়গা থেকে পাওয়া যেত শুধু ছ'খানা করে রুটি এবং ডাল কিংবা তরকারী। কদাচিৎ দুটোই। তবে সে রুটির আকার আমাদের হিসেবে বৃহৎ, সকালে যা পাওয়া যেত ভাতের সঙ্গে দু'খানা রুটিই যথেষ্ট। শৌরীপদ এ বিষয়ে অদ্ভুত করিতকর্মা, সে পাশের এক দরিদ্র সিন্ধী পরিবারের সঙ্গে ব্যবস্থা করে ফেলল, তারা প্রত্যহ সাধুসেবার জন্যে আধসের করে দুধ দেবে, ধারোষ্ণ খাঁটি দুধ, তার বদলে আমরা তাকে দেব আটখানা করে রুটি। অবশ্য সত্যি কথা বলতে গেলে—সে বেচারী এমনিই দুধ দিতে চেয়েছিল, শৌরী জোর করেই রুটিটা নিতে রাজী করাল। আমাদের যখন বাড়তি হচ্ছে, তার নিতে আপত্তি কি! বড়ই গরীব পরিবার—রুটিটা পেয়ে ভালোই হলো তাদের, তাই খুব একটা আপত্তি করল না। তবে দুধও, আধসের তো দিতই, কোনো

কোনোদিন, বাঁচলে, বেশিও দিয়ে দিত। এক একদিন সন্ধ্যার পর ছোট ছেলেটাকে দিয়ে রাবড়িমালাইও পাঠিয়ে দিত; কিংবা আরও কিছুটা দুধ। রাত্রের রুটি থেকে যা বাঁচত দু-তিনখানা করে, তা আমরা ভোরবেলা চায়ের সঙ্গে গোপনে খেয়ে নিতাম 'নাস্তা' হিসেবে। গোপনে খেতে হতো কারণ সাধুর বাসি খাওয়া নিষেধ, বার বার খাওয়াও অশোভন। চা-দুধের কথা অবশ্য স্বতন্ত্র। 'পানকে' দোষ নেই।

এ তো গেল নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যবস্থা। 'ভালোটা-মন্দটা'—মহারাজের ভাষায় Good and bad (আমাদের কাছে 'ভালোমন্দ' কথাটা শুনে ইংরিজিতে তর্জমা করে নিয়েছিলেন—খুব হেসেও ছিলেন) তাও নেহাৎ দুর্লভ ছিল না। ভাণ্ডারা অর্থাৎ সাধুভোজন তো লেগেই থাকত—এমনিও আশপাশের গৃহস্থ বাসিন্দা, দোকানদার তীর্থযাত্রীরা যার যার সাধ্যমতো মিঠাই ফল ইত্যাদি ঘরে এনে পৌঁছে দিয়ে যেত। এক এক সময় এত বেশি এসে যেত যে, ডেকে ডেকে পাড়ার ছেলেদের খাওয়াতে হতো, তারা নিতে না চাইলে ভিখারীকে। তাতেও আবার আমাদের নাম রটে গেল, এই 'বাংগালী মহাৎমালোগ' খুব নির্লোভ ও উদাসীন, তাতে ভক্তের সংখ্যা ও অর্ঘ্যের পরিমাণ বেড়েই যেতে লাগল দিন দিন। ইদানীং ভাণ্ডারাগুলোয় যেতে ইচ্ছে করত না আর—কিন্তু মহারাজ শিখিয়ে দিয়েছিলেন, এতে আবার মান-অপমানের প্রশ্ন আছে, যাওয়া দরকার। কীভাবে ভাণ্ডারায় বসতে হবে, বেদ পাঠের সময় ঠোঁট ও হাত নাড়তে হবে কীভাবে তাও তিনিই শিখিয়ে দিয়েছিলেন।

কিন্তু মাস তিন-চার এইভাবে অলস জীবন যাপন করার পর কেমন যেন একটা অস্বস্তি হতে লাগল। আমার ছেলেবেলা থেকেই কিছু কিছু লেখার অভ্যাস ছিল, আমি দু-দিস্তা কাগজ কিনে ঝালাতে শুরু করলুম, (কলম সঙ্গেই ছিল একটা), ভক্তরা এলে বলতুম ভক্তিমার্গের ওপর বই লিখছি একটা, শুনে তাদের চোখ বড় বড় হতো। সুবিধের মধ্যে এই যে, ওখানটার ধারে-কাছে কোনো বাঙালী সাধু থাকত না। আমি নিশ্চিন্ত হয়ে সাহিত্যচর্চা করতে লাগলুম—মুশকিলে পড়ল বেচারী শৌরীপদ—পড়া বা লেখার কোনো অভ্যাসই ওর ছিল না

কোনোকালে। খেলাধুলো নিয়ে থাকত, সেইটেই বোঝে ভালো। এখানে সে-সব বালাই নেই, থাকলেও সে বিষয়ে সাধুদের আগ্রহ প্রকাশ অশোভন। মধ্যে মধ্যে কথকতা, গীতাপাঠ ইত্যাদির আসরে যেত, সে সবই হিন্দীর ব্যাপার, ওর ভালো লাগত না। বাঙালী সাধুরা থাকেন মায়াকুণ্ডে, কৈলাস মঠে—সেদিকে ঘেঁষতে সাহস হতো না—জেরার ভয়ে। ফলে ওর দিন আর কাটতে চাইত না।

অবশেষে একদিন কতকটা যেন মরীয়া হয়েই—আধো রসিকতা-ছলে আধো আন্তরিকভাবে—একদিন বললে, 'ছাখ যত্তে, আমি ভাবছি এবার সিরিয়াস্‌লি নেব সাধুগিরিটা—'

'তার মনে?' অবাক হয়ে চেয়ে থাকি ওর মুখের দিকে।

'মানে ভাবছি'—একটু যেন লজ্জিত হয়ে পড়ে কেমন, 'ভাবছি জপতপ শুরু করব। ক'দিন ধরেই ভাবছিলুম, কাজ-কর্ম তো কিছু নেই, কবে টাকা জমবে, কবে দেশে ফিরে ব্যবসা-বাণিজ্য শুরু করতে পারব—তার কোনো ঠিকানাই নেই, সে আশা সুদূরপরাহত। মিছিমিছি ঘুমিয়ে আর গঙ্গার পাথর গুনে সময় নষ্ট করে লাভ কি···তাছাড়া ছাখ, যে জিনিসের নকলেই এত সম্মান, এত সুবিধা, এত স্বাচ্ছন্দ্য—সেটার আসলে কি আরও ঢের বেশী পাব না?'

'কিন্তু জপতপ সাধনভজনের তো শিক্ষার দরকার, তার আগে দরকার দীক্ষার। আপনা-আপনি কী করবি তুই?'

'এখন ভাবছি শুধু কোনো একটা নাম ধরে জপই করব শুধু। আগে মনটাকে শান্ত আর একাগ্র করা দরকার। সত্যি-সত্যিই মনটা বসে কিনা দেখা দরকার। তা যদি হয়—মাসকতক দেখি—তারপর হরিদ্বারে গিয়ে ঐ মহারাজকেই ধরব দীক্ষার জন্যে। উনি না দেন উনি কোনো বড় সাধুকে বলে দিতে পারবেন। তবে হঠাৎ ওঁর কাছে যাব না। ছেলে-খেলার জিনিস নয় এসব—আধারটা তৈরি হয়েছে কিনা দেখা প্রয়োজন।'

আমি আর কিছু বললুম না, বাধাও দিলুম না। ঝোঁক হয়েছে থাকে—করুক কিছুদিন। আর কোনো কাজও তো নেই, সত্যি—বেচারীর কী করেই বা সময় কাটে!

এখানে সন্ধ্যার মধ্যেই খাওয়া ও শুয়ে পড়া রীতি। এতোদিন আমরা জোর করে—গঙ্গার ধারে বেরিয়ে, গল্প করে হাই তুলে বিড়ি খেয়ে রাত করতুম। শৌরীপদ এসব ছেড়ে দিল। সে আটটার মধ্যে শুয়ে পড়তে লাগল। ওধারে উঠত রাত আড়াইটে তিনটেয়, মুখহাত ধুয়ে জপে বসত, ভোর সাড়ে পাঁচটা পর্যন্ত জপ করে উঠে দুধ আনতে যেতো সেই সিন্ধী ভক্তের বাড়ি। সেখান থেকে দুধ এনে আমাকে ডেকে দিত, আমি উঠে মুখহাত ধুতে ধুতে ওর দুধ গরম হয়ে যেত—দু'জনে একসঙ্গে বসে দুধ-রুটির নাস্তা সারতুম, একটু দুধ থাকত—পরে একবার চা খাওয়া হতো তাতে। এটা ছিল শৌরীপদর এলাকা। দুধ জ্বাল দেওয়া, চা করা, বিকেলের চা সবই সে করত। আমি চায়ের বাসন-টাসনগুলো মেজে ধুয়ে দিতুম। ঘরদোর যে-যার ঝাঁট দেওয়া হতো—তাও মধ্যে মধ্যে আশপাশের ভক্তদের বাড়ি থেকে ছেলেমেয়েরা এসে করে দিয়ে যেত। ঘর মুছে বিছানা ঝেড়ে চাদর বালিশ বহির্বাস কেচে ঘরের শ্রী ফিরিয়ে দিত। তারা তাতেই কৃতার্থ।...

এইভাবেই চললো আরও মাস চার-পাঁচ। এতেই অভ্যস্ত হয়ে পড়লুম। ইতিমধ্যে অনেকগুলো গল্প আর একটা উপন্যাস লিখে ছদ্মনামে কলকাতাতে পাঠিয়েছি, একটা ছাপাও হয়েছে, কোনোটা ফেরত এসেছে, কোনোটা বা নিপাত্তা—এইভাবে আশা-নিরাশার দ্বন্দ্বে দিন কাটাচ্ছি। এর মধ্যে 'বিজ্‌লী' এসে গিয়েছে, মালিকের ম্যানেজারকে বলে-কয়ে পনেরোর জায়গায় একটা পঁচিশ বাতি বাল্‌ব্‌-এর ব্যবস্থা করেছি, রাত দশটা-এগারোটা পর্যন্ত জেগে লিখি—তারপর ঘুমুই, শৌরীপদ কখন ওঠে, কখন জপে বসে, কখন তার ঘরে শেকল তুলে দিয়ে দুধ আনতে যায় কিছুই টের পাই না। ঘুম ভাঙে যখন দুধ এনে আস্তে আস্তে আমার দরজার কড়াটা নাড়ে—তখনই। সকলে জানে গভীর রাত্রি পর্যন্ত জেগে শাস্ত্রচর্চা করি ও 'ধেয়ানে' থাকি—সুতরাং কেউ কিছু বলে না। নইলে এখানকার সাধুদের সকলেই প্রায় শেষরাত্রে স্নানে যায়, 'বাংগালী মহাৎমা'রা বেলা অবধি ঘুমোয় জানলে তাদের অশ্রদ্ধা হয়ে যেত।

এর ভেতর একদিন—মনে আছে প্রথম শীতের সময় সেটা—অঘ্রা-
ণির শেষ হবে—বাইরে হু-হু করে বাতাস বইছে, এখানকার বিখ্যাত উত্তুরে বাতাস, রাত আটটা নাগাদ ওঠে, সকাল আটটায় ক্লান্ত হয়ে থামে—আমি ডবল কম্বল মুড়ি দিয়ে ঘুমুচ্ছি, কখন সকাল ছ'টা-সাতটা বেজে গেছে টেরও পাই নি। নিশ্চিন্ত হয়ে আছি—দুধ গরম করে শৌরী-পদ ঘুম ভাঙাবে। আজকাল সে তার আগে খানিকটা জল গরম করে নেয়; উঠে গরম জলে মুখ ধুয়ে খানিকটা গরম দুধ খেয়ে শরীর গরম করব—তাই সচেতন হবার চেষ্টাও করি নি। কিন্তু এক সময় জানলার কাঠের ফাঁক দিয়ে উজ্জ্বল সূর্যালোক এসে চোখে লাগায় চমকে ধড়মড় করে উঠে বসলুম। একি, এ যে বেশ রোদ উঠে গেছে বাইরে। সকাল আটটার কম হবে না কিছুতেই। ব্যাপার কি, শৌরীপদ কোথায় গেল? এখনও দোর বন্ধ ক'রে ঘুমুচ্ছি, আশেপাশের সাধুরা কী ভাবছেন! ছি ছি, কী লজ্জা! অন্যদিন ওঁরা স্নানপূজা সেরে ফেরার আগেই আমরা 'নাস্তা' পর্যন্ত সেরে নিই—ওঁরা অতটা টেরও পান না। আজ না জানি কী মনে করছেন!

ব্যস্ত হয়ে দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে দেখি তখনও শৌরীপদর ঘরের কপাটে শেকল তোলা অর্থাৎ দুধ নিয়ে ফেরে নি। কিন্তু, ওর তো এতো দেরি হয় না, ঘড়ির কাঁটার মতো ওর কাজকর্ম নিয়ম-বাঁধা—তবে কি ও বেচারীও ঘুমিয়ে পড়েছিল? কিন্তু যে আড়াইটেয় ওঠে, সে আর কত দেরি করতে পারে! হয়তো শরীরটাই খারাপ করেছিল বেচারীর। আমাকে ডাকে নি—একাই ছটফট করেছে। আমারই আর একটু আগে উঠে খবর নেওয়া উচিত ছিল—

কিছুই বুঝতে পারি না, উদ্বিগ্ন হয়ে উঠি শুধু। দু-একজন প্রতিবেশী 'মহাৎমা'কে জিজ্ঞাসা করি, তাঁরাও কিছু বলতে পারেন না। কেউই দেখেন নি শৌরীপদকে, কোথায় গেছে বলতে পারেন না। উল্টে আমার দিকে বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকান—তখন উপযাচক হয়ে বলতে হয়—রাত্রে বুখার অর্থাৎ জ্বর এসেছিল, উঠতে পারি নি তাই।

অকারণেই এদিক-ওদিক ছুটোছুটি করছি—হঠাৎ সেই সিন্ধী ভদ্র-

লোকটি দুধের লোটা নিয়ে উপস্থিত হলেন, 'বাবা' আজ দুধ নিতে যান নি, কোনো 'বিমার-উমার' হলো কিনা বুঝতে না পেরে ভদ্রলোক নিজেই নিয়ে এসেছেন।

আরও উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলুম। দুধের কথাটা এতক্ষণ অবশ্য মনেই ছিল না, কিন্তু শৌরীপদ যেমন মানুষ, সমস্ত নিয়মমাফিক করা তার অভ্যাস— এটা তার রীতিমতো অস্বাভাবিক আচরণ, এই দুধ পর্যন্ত নিতে না যাওয়াটা।

দুধটা নিয়ে কতকটা যন্ত্রচালিতের মতোই—অথবা বলা চলে অভ্যাস-বশত—শৌরীপদর কপাটের শেকল খুলে ভিতরে ঢুকেই চমকে উঠলুম। সম্ভবত বিছানাতে কাল আদৌ শোওয়া হয় নি—শুলেও, উঠে পরিপাটি করে আবার ঝেড়ে-ঝুড়ে সাফ্ করে টান করে সাজিয়ে রেখেছে, তার ওপর একখানি চিঠি, ঠিক বিছানার মাঝামাঝি—একটা তালা চাপা। ঘরের আর সব আসবাব ও জিনিসপত্র সমস্ত ঠিক যথাস্থানে, মায় ওর খড়ম ও চটিজুতো, ছাতাটি পর্যন্ত। দড়ির আনলায় বহির্বাস কৌপীন পাঞ্জাবি চাদর। অর্থাৎ ঠিক যেমন থাকে অন্যদিন; ভোরবেলা সবাই উঠে পড়ে—বিশেষ এদেশে সাধু-মহাৎমাদের ঘরে বিশেষ চুরি হয় না বলে—শেকলটা তুলে দিয়েই অন্যদিন দুধ আনতে চলে যায়—ঠিক তেমনিই শেকল-তোলা আছে। শুধু মানুষটাই নেই।

তাড়াতাড়ি গিয়ে চিঠিটা তুলে নিয়ে দেখি—আমাকেই সম্বোধন করে লেখা। দু-তিন ছত্র চিঠি তাড়াতাড়ি পেন্সিলে লিখেছে, হাতের লেখা ওর খুব সুন্দর, কিন্তু এতকালের অনভ্যাসের জন্যেই হোক আর মানসিক উত্তেজনার জন্যেই হোক—হরফগুলো বেঁকে বেঁকে গিয়েছে।

চিঠিতে লেখা:

"ভাই যতীন, চলিলাম। যে উদ্দেশ্যে যাত্রা, যদি সফল হয় তো আবার ফিরিব, আবার দেখা হইবে। নচেৎ এই শেষ।

তোমার শৌরীপদ।"

কিছুই বুঝলুম না। কী বা আদৌ কোনো উদ্দেশ্য ওর মাথায় ছিল কি না—তাও জানি না। এ কি তপস্যা—এ কি সিদ্ধিরই আশা? ভগবৎ-

প্রেম ? না কি টাকাপয়সা চাকরি—ঐহিক কোনো ঈপ্সা ? কৈ, কিছুই তো বলে নি কোনোদিন ! বরং বেশ নিশ্চিন্ত এবং প্রফুল্লই দেখাচ্ছিল ক'দিন। একটু জপতপ করছিল বটে—কিন্তু এমন কোনো আকুলতা তো দেখি নি ওদিকে। তবে কোথায় গেল সে, কেন গেল ? আর গেল তো এভাবে একবস্ত্রে গেল কেন ? রোদ্দুর সহ্য করতে পারে না মোটে—ছাতাটাও নিয়ে গেলে পারত তো !···গামছাটা পর্যন্ত নিয়ে যায় নি, যথার্থ যাকে একবস্ত্রে গৃহত্যাগ বলে, তা-ই।

আশ্চর্য ! এমন একটা মতলব আঁটছিল মনে মনে—আমাকে ঘুণাক্ষরেও জানায় নি।

কথাগুলো চকিতের মধ্যেই খেলে গেল মাথায়। নিরুত্তর প্রশ্নগুলো। একটা অবোধ অভিমানও উদ্বেল হয়ে উঠল মনের মধ্যে। এতকালের বন্ধুত্বের এই মূল্য ?

কিন্তু নির্জনে বসে ভাববারও সময় নেই তখন। অন্তত বিশজোড়া কৌতূহলী ও উদ্বিগ্ন চোখ আমার মুখের ওপর আবদ্ধ। সংবাদ একটা দিতে হবে। আর এখনই। মুখভাবকে যথাসাধ্য সময়োচিত করার চেষ্টা করে বললাম, 'তপস্যা করতে যাচ্ছে, আরও নির্জন কোনো স্থানে—এইটুকুই শুধু লিখে রেখে গেছে, কোথায় তা জানায় নি। লিখেছে যদি সিদ্ধি মেলে, যদি ভগবানের দর্শন মেলে তো ফিরবে—নইলে শরীরপাত করবে। বোধহয় পাকদণ্ডী পথ ধরে হিমালয়ের দিকেই গেছে।···একেবারে একবস্ত্রে গেল—ইস ! বাড়তি কৌপীন বহির্বাস পর্যন্ত নেয় নি।··· ছাতা নয়, গামছা নয়—মায় কমণ্ডলুটা পর্যন্ত রেখে গেছে।'

বলে তো ফেললাম, যদি দুপুরে বা সন্ধ্যায় কোথাও থেকে এসে হাজির হয় ছোকরা ! তামাশা নয় তো চিঠিখানা ? অন্য কোনো মতলবে যদি গিয়ে থাকে—?

বেশ একটু ভয়ও করতে লাগল সম্ভাবনাটা মনে করে। ফিরে আসুক, সেইটেই চাই—কিন্তু তখন আবার কি কৈফিয়ৎ দেব এদের !

জিনিসটা যে সোজা হবে না তা এদের সম্মিলিত জয়ধ্বনি ও জিহ্বা ও তালুর সম্মিলনোত্থিত ভক্তিতদ্‌গত প্রশংসাসূচক শব্দেই বোঝা গেল।

এই তো সত্যিকারের 'মহাৎমা'—সাধু।

কে বললে এ যুগে যথার্থ ঈশ্বর-প্রেমী, সত্যিকারের সাধক পাওয়া যায় না! এই তো চোখের সামনেই দেখল তারা। আর এই অল্পবয়সে—নওজোয়ান লেড়কা তো বলতে গেলে!···বার বার সেই জিহ্বা তালুর সম্মিলিত চেষ্টায় চ্যু-চ্যু আওয়াজ উঠতে লাগল। যে শব্দ একই সঙ্গে যেন শৌরীপদকে বাহবা ও তাদের নিজেদের ধিক্কার দেবার চেষ্টা!

শৌরীপদ অবশ্য ফিরল না। সেদিনও না, তার পরের দিনও না। এমন কি এক মাসেও না। চিঠিও দিল না। কোথাও থেকে কোনো খবর পর্যন্ত যোগাড় করতে পারলাম না। এখানকার বহু বাঙালী সাধু উত্তরকাশী যাতায়াত করেন—তাঁদের বলে দিলাম, এদিকে কেদারবদরীর পথে দেবপ্রয়াগ রুদ্রপ্রয়াগে পর্যন্ত খবর নিলাম, কেউ কিছু বলতে পারলেন না। একজন বললেন যে, তিনি তুঙ্গনাথের পথে একজন তরুণ সাধককে দেখেছেন—কিন্তু সে কৌপীনবন্ত জটাজুটধারী সন্ন্যাসী। শৌরীপদ কি জটা রাখবে? রাখলেও একমাস দু'মাসে এমন কি জটা হবে?

যাই হোক—আশঙ্কা ছিল শৌরীপদর মাহাত্ম্য বৃদ্ধিতে আমি একটু ছোট হয়ে যাব এদের চোখে, কিন্তু তেমন কিছু হলো না। বরং যেন খাতির বেড়েই গেল। যে লোকটি দুধ দিত সে অতঃপর দুধ গরম করে দিয়ে যেতে লাগল। একটি ছেলে এসে ঘরে ঝাড়ু লাগিয়ে যায়, তাদেরই বাড়ি থেকে চা তৈরি হয়ে আসে। এমন কি ছত্রের ভিক্ষারও একটা সুব্যবস্থা হয়ে গেল, একটি হিন্দুস্থানী প্রবীণ সাধু স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে সে ভারটা নিলেন। দু'বেলাই ভিক্ষা নিয়ে পৌঁছে দিয়ে যেতেন।

কিন্তু তবুও বড়ই যেন ফাঁকা ফাঁকা ঠেকতে লাগল। সর্বদাই একটা মুখোশ পরে থাকা, প্রাণ খুলে কথা কইব, সে লোক নেই। মাতৃভাষায় গল্প করারই লোক কম। কেমন একটু আশাভঙ্গের মতোও মনে হতে লাগল। এ কী করছি, শুধু কি এই জন্যেই ঘর ছেড়ে বেরিয়েছিলাম? এইভাবে জোচ্চুরি করে খাব বলে? শুধু পেটভাতের তাগিদেই কি বেরিয়ে পড়েছিলাম সেদিন—বাড়িসুদ্ধ লোককে ভাবিয়ে কাঁদিয়ে?

কোথায় গেল সে-সব সোনার স্বপ্ন—বড় চাকরি করে বা ব্যবসা করে কোটিপতি হবার কল্পনা? আর সত্যিই কিছু সর্বত্যাগী উদাসীন নই—সংসারের মোহই কি গেছে একেবারে? অথচ এখন তো আর কোনো উপায়ই রইল না—আর কি পারব, কোথাও গিয়ে নতুন করে জীবন-সংগ্রাম শুরু করতে? তাহ'লে? এইভাবে চিরদিন কোনোমতে প্রাণ-ধারণের জন্য এই পরভৃৎ জীবনযাপন—শুধু খাওয়া ও পরা চালিয়ে চুপ করে আরামে শুয়ে থাকা?

তাছাড়া—শৌরীপদ চলে যাওয়ার পর থেকে ওর কাছেও যেন নিজেকে খুব ছোট মনে হতে লাগল। ও তো তবু মুখোশটা খুলে ফেলতে পারল, সত্যিকারের একটা পথ ধরল। এ পথে কি পাওয়া যায় জানি না, তবে নিশ্চয় কিছু পাওয়া যায়—নইলে যুগ-যুগান্তর ধরে লক্ষ লক্ষ লোক এ পথে যাচ্ছে কেন? মিথ্যাকে ও সত্য করে তুলেছে অন্তত, প্রতি-নিয়ত মিথ্যা কথা বলতে হচ্ছে না, মিথ্যাচার করতে হচ্ছে না। আমি তো কিছুই করতে পারলাম না। দু-একটা লেখা ছাপা হয়েছে ইতিমধ্যে—কিন্তু যা লিখেছি সে তুলনায় কিছুই নয়। এদিকেও যে কোনোদিন নাম করে সংসার চালাবার মতো আয়ের সংস্থান করে বিজয়গৌরবে বাড়ি ফিরব সে আশাও সুদূরপরাহত। এ পর্যন্ত তো এক পয়সাও পেলাম না। কোনোদিন পাব কি না তাই বা কে জানে!

অথচ চোখের সামনে শৌরীপদর সম্মানটা দেখছি। যে ট্রাস্টীদের হাতে এই কুঠিয়াগুলোর বিলির ভার, তাঁরা কেউ ওর মাল সরিয়ে কুঠিয়া অপরকে বিলি করতে রাজী হলেন না। তেমনিই সাজানো রইল সে ঘর, যদি কোনোদিন 'মহাত্মা' ফেরেন এই ভরসায়। শুধু একটা তালা লাগিয়ে রাখা হলো, সপ্তাহে একদিন করে এসে সেই সিন্ধী ভদ্রলোকের ছেলেটি ঝাড়ু লাগিয়ে ঘর সাফ করে রেখে যেতে লাগল।

ভাবতে ভাবতে একদিন মনে হলো এও তো একটা পথ। সাধুসন্ত যদি সেজে থাকতেই হয়—এ-পথে একটু এগিয়ে দেখতে দোষ কি? এদিকেও তো উন্নতির একটা পথ আছে। শিষ্য-শিষ্যা ঘরবাড়ি আশ্রম সিল্কের বহির্বাস হীরের আংটি—কিছুরই যে অভাব থাকে না তা তো নিজে

চোখেই দেখেছি।

এই কথাটাই মনে লাগল শেষ পর্যন্ত। কিন্তু যে পথের বস্তুত কিছুই জানি না সে পথে এগোনোও মুশকিল। জানি না যে—এখানে সেটা প্রকাশ করারও উপায় নেই। সুতরাং একটু সরে যেতে হবে—দূরে কোথাও, কিছু কিছু সাধুসঙ্গ করতে হবে। শেষে স্থির করলাম যে, প্রথমে তীর্থ ভ্রমণের নাম করে বেরিয়ে পড়ব, পথে যে-সব সাধুসন্ত দেখব তাদের সঙ্গে দু-একদিন করে বাস করে—ভেতরের রহস্য না হোক, বাইরের ভড়ংটা যথাসাধ্য আয়ত্ত করব। আর যদি তেমন কোনো লোক পাই—যাঁকে গুরু করতে ইচ্ছা করে—তাঁকেই চেপেচুপে ধরব দীক্ষার জন্য। তাঁর কাছে সত্য কথা বলতেও বাধা থাকবে না, তেমন যাঁরা যথার্থ মহাপুরুষ তাঁরা এসব দুর্বলতা ক্ষমা করতে পারবেন।

এখনই যেটা প্রয়োজন—সেটা কিঞ্চিৎ পাথেয়। তবে এতদিন এখানে রাজার হালে থেকে এটা বেশ বুঝে নিয়েছি যে, যতদিন মাথা নেড়া আছে আর দেহে এই রঙীন কাপড়টা আছে ততদিন ও বস্তুটার অভাব হবে না। অন্তত এদেশে। সুতরাং, ভরসা করে একদিন কথাটা বলেই ফেললাম আমার ক্ষুদ্র ভক্ত বা অনুরাগী-মহলে : 'আর ভালো লাগছে না, ভাবছি এবার তীর্থ-ভ্রমণে যাব।'

ব্যস !! মুখের কথাটি খসাবার ওয়াস্তা। দেখতে দেখতে পাথেয় বলে দু'শো-আড়াইশো টাকা উঠে গেল, সেইসঙ্গে নতুন নরম কম্বল, পুরো-হাতা সোয়েটার, গরম মোজা, গেঞ্জি—কী নয়! মায় একটি সেবকও তল্পীবাহকরূপে সঙ্গে যাবার জন্য প্রস্তুত হলো। ঘরদোর দেখাশুনো করার কোনো ত্রুটি হবে না—আমি যেন নিশ্চিন্ত হয়ে 'পুণ্' সঞ্চয় করি —সকলে বার বার এই কথা শুনিয়ে দিলেন।

আমি তল্পীবাহকটি ছাড়া সকলকার সবকিছু সাহায্যই হাত পেতে নিলাম। তল্পীবাহক সঙ্গে থাকলে সাধুগিরি ছেড়ে সাগরেদগিরি অব-লম্বনে অনেক অসুবিধা হবে।

ঘুরলামও বহু তীর্থে। অবশ্য পাহাড়ের ওপরই—এপথে যা পড়ে।

কেদারনাথ বদরীনাথ তুঙ্গনাথ তো বটেই—একটু এদিক ওদিক বেঁকে-চুরেও গেলাম। মদমহেশ্বর মণিমহেশ ইত্যাদি। গেলাম উত্তর-কাশীতে। শুধু গঙ্গোত্রী যমুনোত্রীটা হলো না। কারণ ইতিমধ্যেই ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম। এ ক্লান্তি ঠিক পথশ্রমের নয়, কেন-না খুব আস্তে আস্তেই গেছি—এক এক জায়গায় বেশ কয়েকদিন করে থেকেছি—সেখানকার সাধুসন্তদের সঙ্গে দেখাশুনো করার চেষ্টা করেছি। আশ্রয় বা খাদ্য কিছুরই অভাব হয় নি কোথাও। এ ক্লান্তি কতকটা মানসিক অবসাদ। তাছাড়া ঘোরার যা আসল উদ্দেশ্য তা সফল হয়েছে। পেয়েছি তাঁর দেখা, যিনি দীক্ষা না দিয়েও আমার সকল সংশয়-সন্দেহ নিরসন করে দিয়েছেন। এখন এ গেরুয়া রাখতেও পারি, দেশে ফিরে গিয়ে জুতো-জামা পরে চাকরি করতেও যেতে পারি, সবই এখন সমান আমার কাছে। আচার-অনুষ্ঠান, বাহ্যিক আড়ম্বর, নিয়ম-কানুনের উর্ধ্বে যে ভগবান তাঁকে ডাকবার সহজ ও সরল রাস্তার সন্ধান দিয়েছেন সে মহাপুরুষ। মনে শান্তি এসেছে, এখন ইচ্ছে করছে কোথাও গিয়ে চুপ করে বসে কিছুদিন বিশ্রাম করি।

আশ্রয় তো ঠিকই ছিল—ঋষিকেশে এসে নিজের সেই কুঠিয়াতেই উঠলাম। সব তেমনি ঠিক আছে, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন—যেন গতকালই গিয়েছি এখান থেকে। একটি জিনিসও নষ্ট হয় নি—হয় নি স্থানভ্রষ্ট। আসার সঙ্গে সঙ্গে 'গোড় লাগি মহারাজ'—বলে পায়ের ধুলো নেবার হুড়োহুড়ি পড়ে গেল। মিঠাই কলা ও মিশ্রীর পাহাড় জমে উঠল সামনে। দুধ এবং কাঁচাপাকা ভিক্ষারও অভাব হলো না। দু'হাতে 'প্রসাদ' বিলিয়েও যা রইল কোনো মানুষের পক্ষে খাওয়া সম্ভব নয়। যথারীতি সকলকে অভয়বাণী ও আশীর্বাদ বিতরণ করে নৈশ আহার শেষ করে শুয়ে পড়লাম সকাল সকাল। এতদিন পরে যেন নিজের বাড়িতে ফিরলাম মনে হলো—যদিও এ বাসাই বা ক'দিনের, হিসেব করে দেখলাম বছর দেড়েক মাত্র এখানে এসেছি—তার ভেতর ছ-সাত মাস বাইরে ছিলাম, তবু এইটেই যেন পাকা আশ্রয় মনে হচ্ছে।

এই প্রসঙ্গেই মনে পড়ল—হঠাৎ মনে পড়ে গেল—শৌরীপদর অন্ত-

ধানের কথাটা। কাল সেই তারিখ। আজ এক বৎসর পূর্ণ হলো। আশ্চর্য, ঘুরতে ঘুরতে ঠিক সেই তারিখটিতেই এসে হাজির হলাম!

কিন্তু বেশীক্ষণ কিছু ভাবা গেল না। নিশ্চিন্ত নিরাপত্তার একটা পৃথক আরাম আছে, সে আরামে ও আলস্যে সব চিন্তা যেন তালগোল পাকিয়ে মাথার মধ্যে একাকার হয়ে গিয়ে তন্দ্রা নামল, দেখতে দেখতে ঘুমিয়ে পড়লাম।

এতদিন খুব ভোরেই উঠেছি—কিন্তু এই ঘরটারই বোধ করি একটা দোষ আছে, অথবা পরিচিত পরিবেশ পুরাতন অভ্যাসের স্মৃতি জাগিয়ে তোলে—গত ক' মাসের অভ্যস্ত সময় পেরিয়ে যাওয়ারও বহুক্ষণ পরে ঘুম ভাঙল। তাও ভাঙল মুহুর্মুহু শিকল নাড়ায় ও চাপা গলার ডাকে: 'যতে, এই যতে! যতীন!'

এ কী! এ যে বিশেষ পরিচিত কণ্ঠ আমার!

শৌরীপদ!

কিন্তু তা কি করে হবে! সে এতকাল পরে কোথা থেকে কী করে আসবে?

আবারও সেই পরিচিত অসহিষ্ণু আহ্বান, 'এই যতে! রোদ উঠে গেল চারদিকে, এখনও তোর ঘুম ভাঙল না! আশ্চর্য!'

ধড়মড়িয়ে চোখ মুছতে মুছতে উঠে পড়ি। সত্যিই বাইরের গাছ-পালায় নতুন রোদের আমেজ লেগেছে, তার সোনালী লাল আলোর আভাও ঘরেও এসে পড়েছে খানিকটা। ছ'টা বেজে গেছে অনেকক্ষণ সন্দেহ নেই। এত বেলা অবধি দীর্ঘকাল ঘুমুই নি। কিন্তু সে কথা যাক, বাই-রের শেকল নাড়ার রহস্যটা আগে পরিষ্কার হওয়া দরকার।

ত্রস্তে-ব্যস্তে এসে দোর খুললাম।

শৌরীপদই। সশরীরে সেই শৌরীপদ। ঈষৎ বিপন্ন ঈষৎ বিরক্ত মুখে দাঁড়িয়ে।

না, কোনো ভুল হয় নি। শৌরীপদ—সে সম্বন্ধে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই।

'ব্যাপার কি বল্ দিকি! ঘরে শেকল দিয়ে মালকানিদের ওখানে দুধ

আনতে গেছি—এসে দেখছি ঘরে তালা দেওয়া। তুইও তো ঘুমোচ্ছিস এখনও পর্যন্ত, তালা দিলে কে?'

তারপর একটু থেমে বেশ একটু বিমূঢ়ভাবেই বললো, 'কী ব্যাপার কিছুই যেন বুঝতে পারছি না। ওদের ওখানে গেলুম, মনে হলো যেন ভূত দেখছে। তারপর ছেলেবুড়ো সব গড়া গড়া মাটিতে পড়ে দণ্ডবৎ প্রণাম। তারপর হাতজোড় করে বলে, 'আপ চলিয়ে মহারাজ, হাম তুরন্ত গরম করকে লে যাতে হ্যায়।...আসছি বুড়ো বুড়ো লোকগুলো মাটিতে পড়ে প্রণাম করছে। সাধুগুলো পর্যন্ত—হেঁট হয়ে নারায়ণ জানাচ্ছে। ব্যাপার কি বল্ তো—এক রাত্তিরে এত কি বদলে গেলুম!'

বিস্ময়বিমূঢ় আমিও—ওর চেয়ে ঢের বেশী।

ওর এই আকস্মিক উদয়ে যতটা—এই প্রশ্নে তার চেয়ে কম নয়!

সুতরাং বিহ্বল দৃষ্টিতে চেয়েই রইলাম, সহসা কোনো উত্তর যোগাল না।

'তোরই বা কী হলো! ভূত দেখছিস নাকি? না মাথা খারাপ হয়ে গেল?' বিরক্তি যেন চাপতে পারে না শৌরীপদ।

'মাথা খারাপ তো বটেই—তবে সেটা কার তাই বুঝতে পারছি না। এতকাল পরে এসে এমনভাবে কথা কইছিস, যেন এই সবে ভোরবেলা বেরিয়েছিলি। তা লোকে অবাক হবে না তো কী?'

'এতকাল পরে—তা—তার মানে?'

এবার যেন ওর চোখে একটা সংশয়-বিহ্বলতা দেখা যায়।

'তুই কতকাল ঘর-ছাড়া তা হুঁশ আছে? ছিলি কোথায়? গিছলিই বা কেন? আমি এদের বলেছিলুম তপস্যা করতে দুর্গম হিমালয়ে গেছে, তাই এত ভক্তি ওদের। তুই আবার যেন অন্য কিছু বলে ফেলিস নি!'

'আমি কত-কাল ঘর-ছাড়া—?' আস্তে আস্তে টেনে টেনে উচ্চারণ করে সে, 'তার মানে? তার মানে কি? কী বলছিস? এই তো গতকাল রাত্রেই তোর সঙ্গে কথা কয়ে শুতে গেছি—?'

কী বলব, হাসব কি কাঁদব—না অন্য লোক ডাকব—না কি ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাব—কিছুই যেন ভেবে পাই না! তবে কি আমারই মাথা খারাপ হয়ে যাচ্ছে?

অনেকক্ষণ সময় লাগল উত্তর দিতে। বললাম, 'তুমি পুরো একটি বছর এখান ছাড়া। এক মিস্টিরিয়াস চিঠি লিখে সরে পড়েছিলে—তার না মাথা, না মুণ্ডু। অপদস্থ হবার ভয়ে তপস্যা করার কথাটা বলেছিলুম—সেই জন্যেই তোমার ঘরটা ভগৎরাম বিলি করতে দেন নি—যেমন তেমনি চাবি দেওয়া আছে!'

আস্তে আস্তে আমার ঘরের সামনের বড় চাতালটায় বসে পড়ে শৌরী-পদ। অনেকক্ষণ ভ্রূ কুঁচকে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বলে, 'তোদের কি সক্কলকার মাথা খারাপ হয়ে গেল রাতারাতি নাকি? আমি এক বছর ঘর-ছাড়া সে কথাটা আমি জানলুম না—তোরা জানলি!'

হঠাৎ মনে পড়ে গেল আমার—সেই টুকরো চিঠিটার কথা। সেটা ফেলি নি। যতদূর মনে হচ্ছে আমার লেখার একখানা প্যাডের মধ্যে ঢুকিয়ে রেখে দিয়েছিলাম এক জায়গায়। বিনাবাক্যে ঘরে গিয়ে কুলুঙ্গী থেকে প্যাডগুলো নামিয়ে উল্‌টে দেখতে লাগলাম। বেরোলও একটু পরে। বাইরে এসে হাতে দিলাম কাগজটা।

শৌরীপদ একেবারে নির্বাক।

খানিক পরে—অকারণেই বার বার কাগজখানা উল্‌টে-পাল্‌টে দেখে অস্ফুটকণ্ঠে শুধু বললে, 'এ আমি লিখেছি? আমি? কিন্তু কেনই বা লিখলুম? কখন লিখলুম?'

'আজ থেকে ঠিক এক বছর আগে। ঠিক একটি বছর পূর্ণ হলো আজ।'

বলছি—সেও কতকটা কলের পুতুলের মতো। এখনও যেন ধারণা করতে পারছি না ওর এই বেঁচে থাকা, ফিরে আসাটা। কিছুই মাথায় ঢুকছে না! ওর কথাবার্তাগুলো তো আরো দুর্বোধ্য। সবটাই অবাস্তব, অসম্ভব বোধ হচ্ছে। ভাবব যে গুছিয়ে কিছু—তাও যেন পারছি না, মাথার মধ্যে তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে সব চিন্তা।

অবশ্য তখনকার মতো ভাবনাচিন্তা বা কথাবার্তা মুলতুবি রাখতে হলো। লালা ভগৎরাম কোথা থেকে ইতিমধ্যেই একগাছা মালা আর একটা 'নারিয়েল' সংগ্রহ ক'রে নিয়ে এসেছেন, মালাটা শৌরীপদর গলায়

পরিয়ে নারকেলটা পায়ের কাছে রেখে অতিকষ্টে ভুঁড়ি সামলে প্রণাম করলেন, তারপর গিয়ে তালা খুলে দিয়ে হাতজোড় করে দাঁড়ালেন, 'আউর কোই সেবা ?'

আরও কয়েকজন ঐ সঙ্গেই হুড়মুড়িয়ে এসে পড়েছিল, বরফি কালাকান্দ, মিশ্রী 'কেলা' প্রভৃতি নিয়ে। মাল্‌কানি বড় লোটার এক লোটা গরম দুধ নিয়ে এসে হাতজোড় করে দাঁড়াল। প্রণামাদির পর চারিদিক থেকে প্রশ্ন, মহারাজ কোথায় কোথায় ঘুরলেন, না কি কোনো এক জায়গাতে বসেই তপস্যা করলেন এতকাল?

ততক্ষণে শৌরীপদ নিজেকে সামলে নিয়েছে। রহস্যের মীমাংসা পরে হবে—এখনকার তাল এখন সামলানো দরকার। অভিনয় করতেই হবে, নইলে এতদিনের ভক্তিশ্রদ্ধার প্রাসাদ ধূলিসাৎ হয়ে যাবে একেবারে, সেই সঙ্গে জীবিকা ও বাসস্থান দুই-ই হয়তো খোয়াতে হবে। সে কিছুই বললো না। স্মিত মৃদুহাস্যে হাত-জোড় করে রইল! বহু পীড়াপীড়িতে শুধু বললো, 'আমাদের চার যুগে পরমাৎমার একবার চোখের পলক পড়ে—তাঁকে তপস্যায় লাভ করব, সে কি এই এক বছরে হয়? কিছুই করি নি, কিছুই জানি না—পরমাৎমা যা করিয়েছেন তাই করেছি, হাত ধরে যেখানে নিয়ে গেছেন সেখানে গেছি। আর কিছুই জানি না, আর কিছু বলতে পারব না।'

মনে মনে ছোকরার তারিফ না করে পারি না। একেবারে সত্যের ধারঘেঁষা এমন অপরূপ মিথ্যা আমি এর আগে আর শুনি নি!

এ বক্তৃতার ফলও আশানুরূপই ফললো। এটাকে ওঁরা 'মহাৎমা'র বা সাধুর যোগ্য বিনয় বলে মনে করে ওর মহত্ত্ব বা মাহাত্ম্য সম্বন্ধে আরও দৃঢ়নিশ্চয় হলো। আর এক দফা প্রণামাদি পুষ্পমাল্য বর্ষণ হবার পর ভগৎরামেরই অনুরোধে আমাদের বিশ্রাম করবার অবকাশ দিয়ে সবাই বিদায় নিলেন।...

তখন বেলা অনেক বেড়ে গেছে। আমিও আর না দাঁড়িয়ে তাড়াতাড়ি স্নানে চলে গেলাম। কিন্তু ফিরে এসে দেখি তখনও সে সেই বিপুল খাদ্যসম্ভার এবং দুধের লোটা সামনে নিয়ে তেমনি বসে আছে—গুম্ খেয়ে।

আমি একটু পরিহাস করে বলতে গেলাম, 'কী মহারাজ, এখনও তেমনি বসে আছ ? ওঠো, একটু খাওয়া-দাওয়া করো !'

শৌরীপদ যেন ধ্যান ভেঙে আমার দিকে তাকাল, 'কিন্তু কিছুই যে এখনও বুঝতে পারছি না রে !'

আমিও থমকে গেলাম যেন। নীরবে ভিজে কাপড়-চোপড়গুলো তারে মেলে দিয়ে ওর সামনাসামনি বসলাম। বাইরের কেউ আর নেই তখন, মুখোশ পরে থাকার কোনো দরকার নেই।

বললাম, 'কিন্তু তোর কি কিছুই মনে পড়ছে না ?'

'কিচ্ছু না। মনে হচ্ছে যেমন রোজ যাই তেমনিই দরজাটায় শেকল তুলে দিয়ে দুধ আনতে গেছি। এর মধ্যে যে এত কাণ্ড হয়ে গেছে, তা একেবারেই কিচ্ছু জানি না। এর ভেতর পুরো এক বছর কেটে গেছে —এ তো একেবারেই অবিশ্বাস্য !'

অবিশ্বাস্য সবটাই। একথাও বিশ্বাস হবার কথা নয়। কিন্তু শৌরীপদকে আমি জানি, সে খামকা এতবড় ধাপ্পা দেবার চেষ্টা করবে না আমাকে। এত মিথ্যে কথা তার আসেও না।

খানিকটা চুপ করে থেকে বলি, 'কিছুই কি তোর মনে নেই ? একটা কথাও না ? কোনো একদিনের স্মৃতি—? কী মনে করে বেরিয়েছিলি, কিংবা আজই বা কোথা থেকে এলি—?'

হঠাৎ আমার হাত দুটো ধরে গাঢ়কণ্ঠে বলে শৌরীপদ, 'বিশ্বাস কর্ ভাই—একটা কথাও মনে পড়ছে না। আমি তোর কাছে মিথ্যে বলছিনে।...এমনিতেই এ রহস্যের কূল-কিনারা না পেয়ে যেন একটা ফিজিক্যাল পেন্ বোধ করছি—এর ওপর আর দগ্ধাসনে।..... এ যেন, মনে হচ্ছে আমার পরমায়ু থেকে একটা বছর বোঁটা থেকে ফুল খসে পড়ার মতো কোথায় পড়ে উড়ে গেছে—একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে !'

বুঝলাম ওর মনের ভাবটা, আমারই তো মাথা ধরে ওঠবার উপক্রম। আমি গলায় জোর দিয়ে বললাম, 'তবে আর ও নিয়ে মাথা ঘামিয়ে লাভ নেই। নে, উঠে পড়্। তুই ওদের কাছে মিছে করে যা বলেছিস তাই সত্যি বলে মনে কর—ল্যাঠা চুকে যাক। পরমাত্মা যা করিয়েছেন

তাই করেছিস, তিনিই জানেন সব।'

'তাই! তা ছাড়া আর উপায়ই বা কি! আর কিছু ভাবতেও পারছি না। মাথা যেন খারাপ হয়ে যেতে বসেছে এমনিতেই—'

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে উঠে পড়ল। আমরা দু'জনেই ওর ঘরে এসে বসলাম। কিছু দুধ ফলমূল খাওয়া হলো। কিন্তু না শৌরীপদ আর না আমি, কেউই ঠিক স্বস্তিবোধ করলাম না দীর্ঘকাল পর্যন্ত। শৌরী অনেকক্ষণ ধরে ঘরের দিকে, বিছানা আসবাব, আর কাপড়চোপড়গুলোর দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে প্রাণপণে স্মৃতির খেই ধরবার চেষ্টা করল —কিন্তু পারল না। আমিও সেই সঙ্গে প্রায় নিশ্বাস রোধ করে ওর দৃষ্টি অনুসরণ করে চললাম, যদি সেই বিহ্বল অন্যমনস্ক দৃষ্টিতে একটুও স্মৃতির আলো ফুটে ওঠে এই ভরসায়।···কিছুই হলো না—শেষ পর্যন্ত হাল ছেড়ে দিয়ে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে চোখ বুজল বেচারী।

তারপর বহু বছর কেটে গেছে! আমি নানা ঘটনার মধ্য দিয়ে কলকাতায় ফিরে এসেছি। সংসার না হোক—একটা ঠাট্ সাজিয়ে বসেছি, কিন্তু শৌরীপদ ফেরে নি। সে সত্যি-সত্যিই সন্ন্যাসী হয়ে গেছে। এখন কোথায় আছে জানি না, শেষ বছর-দুই আগে যা খবর পেয়েছি, উত্তরকাশীতে ছিল তখন। তবে এটুকু জানি যে, আজও সেই-তার-জীবন-থেকে-সম্পূর্ণ-হারিয়ে-যাওয়া একটা বছরের কোনো হদিসই পায় নি, কোনো মীমাংসাই হয় নি সেই বিস্মৃতি-রহস্যের।

এও জানি যে, তার নতুন করে সত্যকার সন্ন্যাস নেওয়ার মূলে এই-টেই আছে, এই অমীমাংসিত রহস্যটা। যোগ-বলে তপস্যার বলে যদি কোনোদিন বিস্মৃতির যবনিকাটা সরে যায়, যদি মনে পড়ে যায় এই এক বছরের কথাটা—তবেই সে স্বস্তি পাবে। কে জানে এতকালে সে ভূতটা ঘাড় থেকে নামল কি না, এই তুচ্ছ রহস্যের অর্থসন্ধান ছেড়ে দিয়ে পরমার্থের দিকে এগিয়ে যেতে পারল কিনা! তপস্যা সত্য-সত্যই সার্থক হলো কি না!

যদি আবার কখনও দেখা হয় তো জানবার চেষ্টা করব।

পরিপূর্ণ ভরসা

পুরীতে গিয়ে শুধুই কাপড়ের দোকান বাসনের দোকান না ঘুরে অথবা স্বর্গদ্বারে নিশ্চল হয়ে ভীড় না বাড়িয়ে যাঁরা সমুদ্রের ধারে একটু আধটু বেড়াতে যান তাঁরা নিশ্চয় লক্ষ্য করেছেন, অনেক বড় বড় বাড়ি, সম্ভবত অবিরাম সমুদ্রের নোনা হাওয়ায় আপনিই ভেঙে পড়ে গেছে, সেই অবস্থাতেই পড়ে আছে, আরও ভাঙছে। যাঁরা করেছিলেন তাঁরা নিশ্চয় অনেক শখ ক'রেই করিয়েছিলেন, মনের মতো ক'রে, পয়সাও খরচ করেছেন ঢের সে সময়ের হিসেবে, কিন্তু পরে হয় তাদেরই শখ ফুরিয়ে গেছে অথবা পরবর্তী পুরুষ যারা মালিক হয়ে বসেছে তাদের অত শখও নেই, যে নিয়মিত মেরামত করায়, আবার এত অভাবও নেই যে গরজ করে বিক্রী করে। অথচ এখানে অন্তত দু'বছর অন্তর মিস্ত্রি না লাগালে বাড়ি রক্ষা করা কঠিন। এখন বড় বড় বাড়িগুলো—ভাড়াটেরাই গরজ করে বাড়িওলাকে খুঁজে বার ক'রে লীজ নিচ্ছে, বাড়ি তারাই রক্ষা করে। কিছু বড় বড় মার্কেন্টাইল ফার্ম অথবা বিভিন্ন সরকারী আপিসের কো-অপারেটিভ সোসাইটি এই সব বাড়ি ভাড়া নিয়ে রেষ্ট হাউস ক'রে রেখেছে। কর্মচারীদের সুবিধে তো হয়ই কোনো কোনো ক্ষেত্রে ইনকাম ট্যাক্সের শ্ল্যাব কমে।

যাই হোক, সে জমা-খরচে আমাদের দরকার নেই। আমরা বলছিলুম ভাঙা বাড়িগুলোর কথা।

এই সব বাড়ি ভেঙে পড়ার পিছনে নিশ্চয় ভিন্ন ভিন্ন কারণ, ভিন্ন ভিন্ন ইতিহাস আছে, যেমন গড়ার সময়ও ভিন্ন ভিন্ন উৎসাহ আশা আকাঙ্খা ছিল। কত সুখ-দুঃখ ঝগড়াঝাটি প্রণয় ও মনোমালিন্যের কাহিনী না জানি জড়িয়ে আছে ঐ ভাঙা বাড়িগুলোর এক একটা ইটে—বেড়াতে বেড়াতে সেই কথাই ভাবি। মোদ্দা কথা আমাদের এই ভাঙা বাড়িগুলো এক বিচিত্র আকর্ষণে টানত, কে জানে কেন। আমাদের সঙ্গীরা

বুঝতেন না, তাদের বোঝাতেও পারতাম না, কী আছে ওগুলোর মধ্যে, কী এত ঘুরে ঘুরে দেখি।

আমরা দেখতাম এক একটা বাড়ি এক এক রকম ভাবে ভেঙেছে। কোথাও এখনও দোতলার একটা দেওয়াল দাঁড়িয়ে আছে, অথচ সামনের দিকের একতলা পর্যন্ত সমভূমি, কোথাও বা শুধুই ওপর তলাগুলো ভেঙেছে, এখনও কিছু খরচ করলে নিচের তলাটা রক্ষা পায়—এই অবস্থায় আছে। কোথাও শুধু একটা কুলুঙ্গীর সঙ্গে একফালি দেওয়াল দাঁড়িয়ে আছে, কে কবে বাতি বা কুপি জ্বেলেছিল, এখনও সে কালিমার চিহ্নটুকু থেকে গিয়েছে।

এই ভাবে ভাঙা বাড়ি দেখে বেড়ানোর মধ্যে একা ছেলেমানুষী তো আছেই। কিন্তু আমার বোন সুপ্তি আরও ছেলেমানুষ। কে বলবে তার এতটা বয়স হয়েছে, এম. এ. পাস করে স্কলারশিপ পেয়ে গবেষণা করছে। আমি তো এমনি দেখেই ছেড়ে দিই, দূর থেকেই নানান সম্ভাবনা কল্পনা করি, সুপ্তির কিন্তু ছুটে প্রত্যেকের কাছে যাওয়া চাই, সম্ভব হলে ভেতরে ঢুকেও দেখবে। কত বারণ করি, বোঝাই যে পুরনো পড়ো ভাঙা বাড়ি, সাপ আছে কি বিছে আছে—দুটি প্রাণীরই এদিকে খুব বাড়বাড়ন্ত, কাল-নাগিনী, গোখরো, কেউটে যত রকম বিষাক্ত সাপের আড্ডা ছিল এদিকটাই এককালে; এখন অনেক বাড়ি, অনেক লোকজন হওয়াতে অনেক কমেছে হয়তো, তবে একেবারে কি আর গেছে; আর, যারা আছে তাদের এই রকম পড়ো ভাঙা বাড়িতে আশ্রয় নেওয়াই সুবিধে, তা এসব কথা কে আর শোনে! সে যাবেই। আর তার দেখার সঙ্গে ব্যাখ্যাগুলিও বড় অদ্ভুত, 'ঐ যে ওধারের ছ্যালটা, মানে ছ্যালের যে পোস্টটা দাঁড়িয়ে আছে এখনও দেখে যেন মনে হচ্ছে না যে একটা বুড়ো হুঁকো হাতে তামাক খাচ্ছে? ছ্যাখ না ছোড়দা, উঁহু উঁহু, ওখান থেকে নয়, এদিকে থেকে ছ্যাখ' কিম্বা, 'ও ছোড়দা ছ্যাখ ছ্যাখ, এই বাড়িটার দক্ষিণ দিকের ঘরখানার প্লাস্টার কী অদ্ভুত দেখাচ্ছে। যতটুকু আছে, ঠিক যেন মনে হচ্ছে না একটা বাঘ কিসের ওপর লাফিয়ে পড়বে বলে তৈরী হচ্ছে? হ্যাঁ হ্যাঁ, তুমি না বললে কি হবে, ঠিক সেই

রকম'।

সুপ্তিটা চিরদিনই এই রকম। আকাশে মেঘ উঠলে ও কোনোদিন দেখে খরগোশ, কোনোদিন সিংহ, কোনোদিন বা দেখে হাঁড়িমুখো একটা মানুষ। আমগাছের সঙ্গে পেছনের তালগাছের মাথাটা মিশে একটা ছায়ার সৃষ্টি করেছে, ও তার মধ্যে দুর্গ দেখবে কিম্বা আফ্রিকার কিলিমাঞ্জারো পাহাড় আবিষ্কার করবে।

কিন্তু সেদিন ঐ রকম একটা ভাঙা বাড়ি দেখতে গিয়েই একটা কাণ্ড হয়ে গেল। কতকটা সেই কেঁচো খুঁড়তে গিয়ে সাপ বেরনোর মতো!

সেদিন আমরা বেড়াতে বেড়াতে চক্রতীর্থ ছাড়িয়ে চলে গিয়েছিলাম। ওখানে একটা বাড়ি বড় অদ্ভুত ভাবে ভেঙেছে। মাঝের আসল বাড়িটা —দুর্গের আদলে তৈরি ছিল অনেকটা, টুকরো-টাকরা এখনও যা দাঁড়িয়ে আছে সেগুলো দেখলে তাই মনে হয়—ভেঙে পড়ে গেছে সম্পূর্ণ, ভেঙেছে সাধারণভাবেই। কিন্তু বাইরে যে নিচু আউট-হাউস-মতো ছিল, চাকর-বাকরদের থাকার জন্যেই হোক বা ভাড়া দেবার জন্যেই হোক, সেটা গোটাই আছে, অথচ আবার নেইও। ঠিক ভেঙে পড়া যাকে বলে তা পড়েনি, এক দিকের দেওয়াল বসে বা ঘূর্ণিঝড়ে অপর দিকের দেওয়ালের মূল উপড়ে, গোটাটাই তিন চারটে খুপরি ঘরসুদ্ধ একদিকে হুমড়ি খেয়ে পড়েছে। সুপ্তির ভাষায়, আসল বাড়িটা চলে যাচ্ছে দেখে তার পায়ে আছড়ে পড়েছে, বলছে, 'ও বাবা আমাকে ফেলে যাস নি'।

এর আগেও একদিন চোখে পড়েছে, তবে সেদিন সন্ধ্যে হয়ে যাচ্ছে এই অজুহাত দেখিয়ে সুপ্তিকে আটক করেছিলুম, কাছে গিয়ে দেখতে দিই নি। আজ আর ঠেকানো গেল না, আমরা ওর মতলব বোঝার আগেই এক রকম ছুটে বালি ভেঙে উঠে গেল। কিন্তু ঘরগুলোর সেই অর্ধেক-বালিতে-বুজে-যাওয়া দরজার একটাতে উঁকি মেরেই একটা, 'ও বাবা'! কি ঐ ধরনের অস্ফুট শব্দ ক'রে তেমনিই পড়ি কি মরি করে ছুটে নেমে এলো আবার—'ও মাসিমা গো, ওর মধ্যে একটা জ্যান্ত মানুষ!'

'মানুষ! যাঃ, ওর মধ্যে কখনও মানুষ থাকতে পারে?' আমি বলি।

মাসিমা কিন্তু গম্ভীর মুখে বলেন, 'থাকবে না? ওখানেই তো থাকবে,

থাকবার কথা ! তোদের লেখাপড়া শিখে বুঝি এই বুদ্ধি হচ্ছে সব ! এই রকমের পোড়ো বাড়িই তো ওদের আইডিয়াল আড্ডা। সাধারণ লোক থাকতে পারে না, অথচ ঘরটা কোনোমতে দাঁড়িয়ে আছে, মানে রোদটা জলটা আটকায়, কেউ খোঁজও করবে না কোনো দিন, উঁকি মেরে দেখবেও না—এই রকমই তো খোঁজে ওরা। এ তো জানা কথাই যে এখানে একটা আড্ডা থাকবে !'

'কারা মাসিমা ? কাদের আড্ডার কথা বলছ ?' বোকার মতো প্রশ্ন করি।

মাসিমা আমার নির্বুদ্ধিতায় হতাশ হয়ে পড়েন। নির্বুদ্ধিতা হয়তো তত নয়—যত অজ্ঞানতা। হাল-ছেড়ে-দেওয়ার মতো কাঁধের আর হাত দুটোর একটা ভঙ্গী ক'রে বলেন, 'চোর ডাকাতদের আড্ডা। কিম্বা স্মাগলারদের—আবার কাদের ! এরকম একটা আড্ডা না থাকলে চলে ওদের ? দিনের বেলায় ঘাপটি মেরে থাকবে, রাত্রে চোরাই মাল এনে তুলবে—ভোরবেলা কেনা-বেচা, ভাগ-বাটোয়ারা করবে—তার একটা জায়গা চাই না ? তোরা কি এটাও বুঝতে পারিস না ? হা ভগবান।'

কিন্তু তাঁর এই উচ্চমার্গের বুদ্ধির অহঙ্কারের বেলুনে পিন ফোটানোর মতো ফুটো করার চেষ্টা করে স্নিগ্ধা, 'না মাসিমা, ঠিক চোর ডাকাত বলে মনে হলো না, বরং অনেকটা সাধু সন্ন্যাসীর মতো দেখতে। ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল মাথায়, কতকটা সিংহের কেশরের মতো, তেমনি গোঁফ দাড়ি—এতখানি দশাসই চেহারা, তার ভেতরই গলায় কী সব মালা, বোধহয় মোটা মোটা তুলসীর মালা হবে। কপালে তিলক, নইলে ভাবতুম দরবেশ ফকির কেউ হবে, কাপড়টার দিকে চাইবার সময় হয় নি, তবে এক ঝলক যা দেখেছি গেরুয়াই মনে হলো। আমার দিকে ড্যাব ড্যাব ক'রে চেয়ে আছে দেখেই ভয়ে আত্মাপুরুষ খাঁচা-ছাড়া হবার যোগাড়, ছুটে পালিয়ে আসতে পথ পাই না, অত ভালো ক'রে আর দেখাও হলো না তাই !'

আবারও সেই করুণার হাসি মাসিমার, 'সত্যি, তোরা যা মানুষ হয়েছিস না ! কোনোদিন না বাছুরে খেয়ে যায় ঘাস মনে করে। কোনো

কালে ক'রে-খেতে পারবি না এই বলে দিলুম। সংসার করা তো দূরের কথা। চোর ডাকাতরা তো বেশির ভাগই অমনি সন্ন্যিসী ফকির সেজে থাকে, যাতে লোকে বা পুলিশে না সন্দেহ করতে পারে। ওরা বুঝি, তোদের বিশ্বাস, যেমন কালি-ঝুলি, গা-ময় তেল মেখে ছিঁচকে চোর কি সিঁধেল চোররা চুরি করতে যায়, তেমনি ভাবেই সেজে থাকে সব সময়? না চোর ডাকাতের কোনো আলাদা পোশাক আছে যাতে দেখলেই চোর বলে চিনতে পারা যায়? · নে চ এখন, আর দাঁড়াস না। আমাদের সন্দেহ হয়েছে পুলিশে খবর দিতে পারি এ বুঝলে আর রক্ষে রাখবে না।'

'কী করবে? মারধোর?' অবিশ্বাসের সুরে প্রশ্ন করে সুপ্তি।

'মারধোর? এখেনে এই নির্জনে কেটে সমুদ্দুরের জলে ভাসিয়ে দিলেই বা কে জানছে বল্?' বলতে বলতেই সম্ভাবনাটা কল্পনায় দেখে আরও ভীত হয়ে পড়েন, 'দুগ্‌গা দুগ্‌গা, এখান থেকে পালাতে পারলে বাঁচি।

তোদের যেমন বিদঘুটে বেড়ানো! চ, চ—'

সেদিন চলে আসতেই হলো। কিন্তু সুপ্তির ঘুম নেই। ওই কৌতূহলটা শিশুর মতোই আছে এখনও। তেমনি প্রবল এবং সক্রিয়। পরের দিন বেলা শিনটের সময়ই আমাকে জাগিয়ে খোশামোদ করে, অসময়ে চায়ের ঘুষ দিয়ে টেনে বার করল। বেশি দেরি করলে মাসিমারা উঠে পড়বেন, তাহলেই নানান কৈফিয়ৎ, আর যাওয়া হবে না।

তবু আমি একটু ভয় দেখাবার চেষ্টা করলুম, 'যদি সত্যিই ওটা কোনো চোর-ডাকাতের গোপন আড্ডা হয়? আমরা ওর সন্ধান পেয়েছি আবার আজও যাচ্ছি, যদি আমাদের গোয়েন্দা ভেবে সত্যিই খুন-টুন করে?'

'যাও যাও,!' সুপ্তি গলাব অদ্ভুত একটা শব্দ করে আতঙ্কটা উড়িয়ে দিল, 'তাহলে তো ওরাই বরং ভয় পাবে। পুলিশের লোক ভাবলে তো কথাই নেই।'

'তুই জানিস না। দু'জন একজনকে সরিয়ে ফেলা কিছুই নয় ওদের পক্ষে।'

'আমি বলছি ছোড়দা, চোর ডাকাতের আড্ডা হলে—আমরা হঠাৎ

সন্ধান পেয়ে গেছি জানলে তারা কেউ আবার আমরা যাব কিনা সে অপেক্ষায় বসে থাকবে না। আলিবাবার গুহা ফাঁকা ক'রে দিয়ে সরে পড়বে।'

যুক্তিটা আমারও মনে লাগল। আর কথা বাড়ালুম না।

তবু কাছাকাছি গিয়ে একটু ভয় যে না হয়েছিল তা নয়। আলিবাবার মতো গুহা ফাঁকা করেও আশপাশে ওৎ পেতে থাকতে পারে, কারা সন্ধান পেল জেনে সাবাড় ক'রে দেবে।…কিন্তু একেবারে সামনে পৌঁছবার খানিকটা আগেই সে লোকটিকে দেখা গেল—মাসিমার 'খুনে ডাকাত', সুপ্তির 'সাধু ফকির'। ঐ হেলে-পড়া ঘরগুলোর সামনে একটা বালির ঢিবির ওপর দাঁড়িয়ে আছে লোকটি। স্থির পাথরের মতো। দৃষ্টি সামনে সমুদ্রের দিকে নয়, তার একটু ওপরে, আকাশে বদ্ধ। যেন ঐ দূর দিগন্তের চক্রবালরেখার ওপর নীল আকাশ থেকে কিছু একটা উড়ে আসবে বা কিছুর উদয় হবে, তারই প্রতীক্ষা করছে।

দাড়ি গোঁফ ঝাঁকড়া চুল মিলিয়ে ভয়াবহ চেহারা তাতে সন্দেহ নেই, চেহারাটাও বেশ শক্ত ধরনের, মুখখানা এতখানি। সুপ্তির অনুমান ঠিক নয়, পরনে গেরুয়া কাপড় নেই, সাদা কাপড়ই পাট ক'রে পরা, কতকটা বৈষ্ণব সাধকের বহির্বাসের মতো।

সেটাও ছেঁড়া, আর খুব একটা ফর্সাও নয়।

'কাজ নেই রে সুপু। চলে আয়! সাধু না ছাই, নিশ্চয় পাগল।'

'পাগল তো গলায় অতগুলো মালা কেন?'

'ঐটেই পাগলামি। এক একটা ঝোঁক চাপে পাগলদের জানিস না? ঐ মালা পরাও ঝোঁক। শুনেছি কলকাতায় আগে একটা পাগলী ছিল, সে যোগাড় করে করে অসংখ্য চুড়ি আর হার করিয়ে পরত শুধু। সোনা রূপো নয় অবিশ্যি, পেতল কাঁসাই, কিন্তু সে এত হয়ে গিয়েছিল যে তার ওজনেই বুড়িটা নড়তে পারত না, সর্বদা রিক্‌শা ক'রে যাতায়াত করত।

সুপ্তির কিন্তু অসীম সাহস। বলে, 'দেখিই না। পাগল হলেও শান্ত পাগল। ছাখ না, চেঁচাচ্ছেও না কিম্বা আপনা আপনি ঝগড়াও করছে

না রাস্তার পাগলদের মতো। আর, দু'জন তো আছি আমরা, একা আর ও কী করবে ?'

আমি আর কোনো যুক্তির অবতারণা করা কি বাধা দেবার আগেই সে এগিয়ে চলে গেল কথাগুলো বলতে বলতেই। আমি আর কি করতে পারি এক্ষেত্রে, পিছু পিছু এগিয়ে যাওয়া ছাড়া ?

সামনে তো গেল, কিন্তু কী কথা কইবে তা বোধহয় সুপ্তিও জানত না, কি ভাষায় কথা বলা উচিত তাও না। শেষ পর্যন্ত মাতৃভাষা সম্বল ক'রেই ডাকল, 'বাবা, শুনছেন ?'

এবার লোকটি মুখ ফেরাল—সুদূর দিগন্ত থেকে কাছের মানুষটির দিকে। খুবই শান্ত গলায় বললো, 'বলুন মা' ?

বাংলায়ই বললেন, তবে ঈষৎ একটু বাঁকা টান। মানে বাঙালী নন, বাংলা ভালো জানেন, এই মাত্র। উড়িয়া কি বিহারী তা অবশ্য বোঝা গেল না।

মোদ্দা ততক্ষণে সুপ্তির বুদ্ধি শুদ্ধি সব গুলিয়ে গেছে। সে বোধহয় ঠিক এই ধরনের শান্ত ভদ্র উত্তর আশা করে নি। অথচ কি আশা করেছিল তা সে নিজেও জানে না। ঝোঁকের মাথায় এগিয়ে গেছে শুধু, বারণ করেছি ভয় দেখিয়েছি বলেই জেদ করে বাহবা নেবার ঝোঁকে।

এবার বেশ একটু থতমত খেয়ে বললে, 'আপনি—আপনি এইখানে থাকেন ? এই ভাঙা ঘরে ?'

'যখন যেখানে মাথা গোঁজার মতো জায়গা পাই তখন সেখানেই থাকি মা। ভগবানই ব্যবস্থা ক'রে দেন দরকার মতো, কোথাও না কোথাও। ও আমি তাঁর ওপরই ছেড়ে দিয়েছি, এখন তাঁরই গরজ।'

'তা, তা আপনি কি করেন ? মানে—চলে কিসে ?'

'সেও আমি খবর রাখি না মা। সে ভারও ওঁর ওপরই চাপিয়ে দিয়েছি।' জগন্নাথের মন্দিরের দিকটা দেখিয়ে দেয় লোকটি।

'তার মানে কিছুই করেন না ! বেশ আছেন যা হোক।' সুপ্তি বলে ফেলে, তার পরই কেমন যেন অপ্রস্তুত হয়ে ছোট্ট ক'রে জিভ কামড়ে বলে, 'আজ আপনার খাওয়া হয়েছে ? মুখ তো শুকনো দেখছি।'

'না মা। এখনও পর্যন্ত খাওয়া হয় নি।' লোকটি সহজ ভাবেই স্বীকার

করে।

'ঠিক ধরেছি ! তাই তো বলি। কিন্তু এধারেও তো মুশকিল. আমাদের সঙ্গে তো খাবার জিনিস কিছু নেই। পয়সা দেব, কিনে খাবেন ?'

'কে কিনতে যাবে মা? তা ছাড়া পয়সার কারবার আমি অনেকদিন ছেড়ে দিয়েছি।'

'তাই তো।' সুপ্তির চোখ দুটো ছলছল করে ওঠে, 'দেখুন, আমার ব্যাগে গোটাকতক টফি আছে, খাবেন ?'

এবার লোকেটি হাত জোড় করে।

'কিছু মনে করবেন না মা, প্রসাদ ছাড়া আমি আর কিছু খাই না।'

'সে কি ! কে আবার এত গরজ ক'রে আপনাকে রোজ রোজ প্রসাদ পৌঁছে দেয় শুনি ! আজ তো, এই সন্ধ্যে হয়ে গেল, কেউ তো এলো না —কী খাবেন এখন ? উপোস ক'রে থাকতে হবে তো ?' সুপ্তি যেন রীতিমতো উত্তেজিত হয়ে ওঠে।

'দু-একদিন উপোস দিলেই বা ক্ষতি কি মা ? ব্রত পার্বণে তো কত লোক কত উপোস করে। আপনি ও নিয়ে এত ব্যস্ত হবেন না। ভগবান অন্ন মাপছেন, ঠিক এসে পৌঁছবে, না মাপিয়ে থাকলে আপনি আমি কি করতে পারি বলুন ?'

এরপর আর কি বলার থাকতে পারে ? অগত্যা ফিরতে হলো। এসব কথা-বার্তায় আমাকে খুব বিচলিত করতে পারে নি, পৃথিবীর তাবৎ ভণ্ডই এই ভাবে কথা বলে বোধহয়—ওর হাত থেকে অব্যাহতি পেয়ে বাঁচলুম, আমার এই মনের ভাব ; কিন্তু সুপ্তি দেখলুম বেজায় চটে গেছে লোকটার ওপর, তবে সে অন্য ধরনের চটা, আসলে সে উদ্বিগ্নই বেশী। সে গজগজ করতে করতে বললো—

'কী রকম লোক রে বাবা। কিছু করব না, কোথাও যাব না। পয়সাও নেবো না। কত ভিরকুটি। কে বারো মাস তিনশো পঁয়ষট্টি দিন ওঁর জন্যে এই তেপান্তরের মাঠ আর সাহারার বালি ভেঙে এই ভাঙা হেলে-পড়া ভূতুড়ে বাড়িতে প্রসাদ পৌঁছে দিয়ে যাবে তাই শুনি ? যতো সব বাজে কথা, বাজে বায়নাক্কা। ভড়ং দেখানো আর কি – '

'কেন ওর কথা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছিস! তুইও যেমন। বাজে লোক একটা। হয় মহা ধড়িবাজ, নয়তো পাগল।'

'কৈ পাগলের মতো তো কথাবার্তা নয়, বেশ শেয়ানার মতোই তো বুঝে সুঝে কথা বলছে।'

'আরে, সবাই কি আর চেঁচানো পাগল হয়, সবাই গায়ে কাদা মেখে বেড়ায়! এও এক রকমের পাগলামি। এক এক জনের এক এক দিকে মাথার ইস্ক্রুপ ঢিলে থাকে। একটা ছেমো চাপে মাথায়, শুধু সেই দিকটা ছাড়া আর সব দিকে দেখবে ঠিক আছে। এইরকম পাগলই তো এখন পৃথিবীতে বেশী!'

আমি বিজ্ঞ ভাবে বোঝাবার চেষ্টা করি। পাগলের সম্ভাবনাটার ওপরই জোর দিই। সে সম্ভাবনাটা আমার কাছে বেশি সম্ভব বলে মনে হচ্ছে—সেটা ও বিশ্বাস করবে না, এতক্ষণে বেশ বুঝে নিয়েছি।

সুপ্তির এসব দিকে খেয়ালও নেই অবশ্য। সে গজগজ ক'রেই যাচ্ছে। মনে হচ্ছে যেন ব্যক্তিগত ভাবে ওর কোনো ক্ষতি হয়েছে, কিম্বা কোনো অপমানবোধ।...

বাড়ি ফিরে যথারীতি একচোট বকুনিও খেল মাসিমার কাছ থেকে। আরও যাঁরা ছিলেন, মানে, যেখানে আমরা উঠেলাম—তাঁরাও খুব বকলেন। যদি পাগল না হয়ে সত্যিই ওটা চোর ডাকাতের আড্ডা হয়! হয়তো চোরাই মাল জড়ো করার জায়গা। তাই যে নয়—এখনও নিশ্চিত করে বলা শক্ত। হয়তো ওদের ওপর থেকে সন্দেহটা ঘুরিয়ে দিতেই লোকটা সাধু-সন্ন্যাসীর ভান করেছে। সুপ্তি নীরবে তিরস্কারই হজম করল, তবে অন্যদিনের মতো হেসে উড়িয়ে দিল না, অনেকক্ষণ মুখটা গোঁজ করে রইল।

আমার বিশ্বাস ও এখনও সেই লোকটার কথাই ভাবছে। এসব, তিরস্কার বা বকুনি ওর কানেই পৌছায় নি ভালো ক'রে।

তাই বলে ও যে মনে মনে এই মতলব আঁটছিল তা কে জানে!

তিন চারদিন পরে একদিন সকালে মন্দিরে গিয়ে দর্শন শেষ করে আনন্দ

বাজারে ঢুকে পাগলের মতো মিষ্টি প্রসাদ কিনতে লাগল। খাজা, জগন্নাথ বল্লভ, ফেনি, মগজ লাড়ু, পারিজাত—নোনতাও কিনলো কিছু, মুন সুরমা ইত্যাদি—অনেক টাকার খাবার।

'কি হবে রে এত?' অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলুম।

তার উত্তরে শুধু বললো, 'কি আবার হবে! সবাই খাবে। বাঃ!···রোজ রোজ তোমাদের ঐ বাঁকওলা ভারীকে ডেকে কতকগুলো বাজে সিঙ্গাড়া আর চালের গুঁড়ির পান্তুয়া না খেলে বুঝি হয় না? একটু ভালো খাবার ছ্যাখ দিকি!'

আমি আর কথা বাড়ালুম না। স্কলারশিপের টাকাটা ক'মাসের এক সঙ্গে পেয়েছে, ওর এখন ট্যাঁক ভারী, খরচ করতে চায় তো করুক না।···

সেদিন বেরোলাম যখন তখনই সন্ধ্যা হয়ে এসেছে প্রায়। সুপ্তি আজ আর সাধারণ ছোট সাদা ব্যাগটা না নিয়ে বড় নতুন ব্যাগ, যেটা ওকে বড়দা দিয়েছিলেন স্কলারশিপের খবর পেয়ে, টিফিন বাক্স নিয়ে যাবে এই আশায়, সেটা নিতে গেল কেন তা অত কারুরই খেয়াল হয় নি। সে ব্যাগও যেন বেশ ভর্তি। সেটা চোখে পড়লেও ভেবেছি অন্ধকার হয়ে আসছে বলে বড় টর্চটা নিয়েছে হয়তো, তাই অত পেটমোটা দেখাচ্ছে।

খানিকটা চলার পর সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে সুপ্তির দিকে ফিরে বললুম, 'তোর ব্যাগে কি, সত্যি করে বল তো!' প্রশান্ত মুখে ও উত্তর দিল, 'এ হাতে নিয়ে মিথ্যে বলার তো জো নেই, আগে জিজ্ঞেস করলে বিপদে পড়তাম। প্রসাদ আছে!'

'ও! তাই সকালে অত প্রসাদ কেনা হলো, ঐ পরিমাণ! সেই হতভাগা লোফারটাকে দেবার জন্যে বয়ে বয়ে নিয়ে আসছিস! ধন্য তুই। আসলে সে নয়, তুই-ই পাগল!'

'চুপ চুপ! ছিঃ, যতক্ষণ না ঠিক জানছি ততক্ষণ ওভাবে বলতে নেই কারও নামে। এই তো এসেই গেছি।'

ততক্ষণে বেশ ঘোর ঘোর হয়ে এসেছে। আর একটু আলো থাকতো হয়তো, কিন্তু কিছুক্ষণ থেকেই একটু একটু ক'রে মেঘ জমছে আকাশে,

তাতেই অন্ধকার লাগছে। তবু তার মধ্যেই দেখা গেল, আবছা, লোকটি সেই বালির ঢিপির ওপরই বসে আছে চুপ ক'রে। কাছে যেতেই হেসে বললে, 'এস মা। বুঝতে পারছি আজ প্রসাদ এনেছ আমার জন্যে। তা দাও—'

বলে খুব সহজেই হাত বাড়িয়ে দিলে।

সুপ্তি এনেছেও একগাদা খাবার। দু'হাতে কুলোবার কথা নয়। বেগতিক দেখে লোকটা সে সব নিয়ে পাশে বালিতেই নামিয়ে রাখতে লাগল।

'আহা হা, মাটিতে রাখছেন! একটা জায়গা টায়গা নেই?' সুপ্তি ব্যস্ত হয়ে ওঠে।

'মাটি নয় মা, বালি। পরিষ্কার বড় বড় বালি। ঝেড়ে ফেললেই চলে যায়। এখানে কোনো রুগী এসে থুথুও ফেলে না কি কুকুর-টুকুরও আসে না।' এই বলে লোকটি হাসল বোধহয় একটু। অন্ধকারে অত ভালো দেখা যায় না, মনে হলো যা। এমনিতেই নির্বিকার, বৃথা কোনো লজ্জা নেই, ততক্ষণে খেতেও শুরু ক'রে দিয়েছে।

খেতে খেতেই বললো, 'তাহলে মা সেদিনের প্রশ্নের উত্তর পেয়ে গেলে নিজেই। কে গরজ ক'রে এখানে প্রসাদ পৌঁছে দিয়ে যায়, সেই প্রশ্নটার?'

বলে ভরা গলাতেই খুব খানিকটা হেসে নিল সে।

অন্ধকারে দেখা গেল না, কিন্তু বেশ অনুমান করতে পারলুম, সুপ্তির মুখ লাল হয়ে উঠল। সে একটু চুপ ক'রে থেকে বললো, 'কিন্তু এ তো একদিন।'

'বিরাট যন্ত্র চলছে মা, যিনি চালাচ্ছেন তিনি জানেন এর কোন্ নাট-বলটু দিয়ে কতটুকু কাজ হয়। তুমি এর তেমনি একটা বোলটু কিংবা অন্য কোনো অংশ। এমন আরও ঢের আছে। কাজ ঠিকই চলছে। আজ তোমার ওপর তিনি ভর করেছেন এই মাত্র। কোন্ দিন কাকে দিয়ে করাবেন সে তো ঠিক করাই থাকে মা।'

সুপ্তি যেন একটু আহত হলো। কে জানে এতখানি হৃদয়বত্তার পরিচয়ের

পরিবর্তে সে উচ্ছ্বসিত কোনো কৃতজ্ঞতা আশা করেছিল কিনা। সে বালিতে বসে পড়েছিল, এবার উঠে দাঁড়িয়ে বললো, 'তাহলে আমরা যাই, ওঁরা হয়তো ভাবছেন।'

'যাও মা।' খেতে খেতেই সহজভাবে উত্তর দিল লোকটি।

'ভাবছেন শুধু নয়, হয়তো এতক্ষণে পুলিশে ছুটেছেন।' অকারণেই বলি. স্বপ্নির সূক্ষ্ম অভিমান বা অপমান-বোধে প্রলেপ দিতেই কিছুটা, 'নে টর্চটা বের কর, যাই।'

'ঐরে টর্চ তো আনি নি। মনে করিয়েও তো দাও নি।'

'সে কি! তুইই তো নিস রোজ। মনে আবার কবে করাই? অত বড় ব্যাগ নিয়েছিস, আমি তো আরও তাই নিশ্চিন্ত আছি যে টর্চটাই নিয়েছিস, তার বদলে যে খাবারেই বোঝাই করেছিস কী ক'রে জানব?'

'তা একটা লোকের পেট ভরার মতো' স্বপু যেন একটু 'কিন্তু' হয়ে বলতে যায়—

'তা তো জানি না দিদিমণি। তুমি তো সে কথাটা ঘুণাক্ষরেও ভাঙো নি কারও কাছে। আমরা কি আর হাত গুনব!'

কিন্তু কথা কয়ে কোনো কাজ হবে না। অবস্থা গুরুতর হয়ে উঠছে ক্রমশ। ওদিকে মেঘ, এদিকে সরকারের নির্দেশে রাস্তা নিষ্প্রদীপ। দেখতে দেখতে এই ক'মিনিটেই এত অন্ধকার হয়ে এসেছে যে স্বপ্নির মুখটা এত কাছে থেকেও দেখা যাচ্ছে না। ঐ লোকটারও সাদা কাপড়টা মাত্র বোঝা যাচ্ছে। সমুদ্রের ধার ধরে এ সময় ফেরা একেবারেই উচিত নয়, উঠে গিয়ে রাস্তাই ধরতে হবে, কিন্তু তাও কি বিনা আলোয় যাওয়া নিরাপদ হবে? রাস্তা পর্যন্ত যাবই বা কি ক'রে?

এমনই অসহায় বোধ হলো সে সময়টায় যে বৃথা জেনেও প্রশ্ন করলুম, 'আপনার কাছে কোনো আলো-টালো নেই, না? নিদেন দেশলাই? এখন উপায়? বোনটি টর্চ ফেলে এসেছে, এদিকে তো বেশ অন্ধকার হয়ে গেল দেখছি।'

অন্ধকারেই নিরুদ্বিগ্ন উত্তর এলো, 'জগন্নাথের দেশে এসেছ, তাঁর ওপরই পরিপূর্ণ ভরসা রেখে চলে যাও বাবা, কোনো ভয় নেই। তিনিই একটা

ব্যবস্থা করে দেবেন নিশ্চয়।'

অগত্যা।

স্বপুর হাত ধরে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবার চেষ্টা করলুম। কিন্তু কে কার হাত ধরে, আমিই তিনবার হোঁচট খেলুম—পাঁচ পা না যেতে যেতেই। বালিতে হোঁচট লাগে না ঠিকই, তবে পা মচকে যাওয়ার সম্ভাবনা পদে পদে। আকাশে তারা থাকলেও তবু একটা আলোর আভা আসে, উঁচু নিচু বোঝা যায়, এখন এসবই একাকার।

আরও একটু গেছি, হঠাৎ একেবারে পাশে দপ করে একটা টর্চ জ্বলে উঠল।

ভয় পেয়ে চমকে ওঠার কথা, উঠলুমও। স্বপ্তি তো সোজাসুজি 'বাবা রে' বলে আমাকে জড়িয়ে ধরল। কিন্তু দেখা গেল যেমন ভয়ঙ্কর কিছু নয়। একটি বছর চৌদ্দ পনেরোর উড়িয়া ছেলে টর্চ নিয়ে বোধহয় ছুটেই এসেছে, কারণ হাঁপাচ্ছে তখনও। বললে, 'বাবা এই টর্চটা পাঠিয়ে দিলেন আপনাদের।'

'তবে যে উনি বললেন, কিছু নেই ওঁর কাছে? কোনো কিছুই থাকে না?' স্বপ্তির কণ্ঠস্বরে কি একটু অকারণ তীক্ষ্ণতা প্রকাশ পায়?

'না, ওঁর কাছে কিছুই নেই। মাচিসও থাকে না। এ আমার টর্চ, আমি এই এলুম। ওদিকে দিয়ে এসেছি, আমি দেখেছি আপনাদের। আপনারা লক্ষ্য করেন নি। তাতেই বাবা বললেন, ওদের দিয়ে আয় বাতিটা, ওদের আলোর বড্ড দরকার।'

'তা তুমি? তোমার লাগবে না?'

'না না, আমি টর্চ থাকলেও কখনও জ্বালি না। জানা জায়গায়, অন্ধকারেই বেশ যাতায়াত করি। আর খানিক পরেই তো চাঁদ উঠবে, মেঘ থাকলেও পথ-ঘাট বোঝা যাবে তখন।'

সে পিছন ফিরছে বলতে বলতেই।

'এটা তোমাকে ফেরৎ দেব কী ক'রে?'

'সেজন্যে ব্যস্ত হতে হবে না। আপনাদের কাছেই রেখে দেবেন। আমি আপনাদের বাসা জানি, আমি নিয়ে নেব।'

বাড়ি পৌঁছে প্রাথমিক ঝড়টা কাটার পর মেজাজ একটু থিতিয়ে যেতে মাসিমা প্রশ্ন করলেন, 'তা সে ছোঁড়া আমাদের ঠিকানাই বা জানবে কি ক'রে! ঐটুকু ছেলে, যা শুনছি ও-পাড়াতেই বাড়ি—য়্যাঁ?'

তারপর নিজেই আবার বললেন, 'না জানে না জানলো। কাল পরশু দেখে, কেউ না আসে, একদিন বেলাবেলি গিয়ে ঐ মিন্‌সেটাকে দিয়ে এলেই হবে। ওর তো জানা-শুনো!

তারপর টর্চটা অকারণেই হাতে ক'রে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে বললেন, 'টর্চটা কিন্তু বেশ দামী, কতখানি লম্বা দেখেছিস? কত দূর পর্যন্ত আলো যায়? নতুনও, না? আমাদের এমনি একটা কিনলে হয়।'

'তুমি কি এটা মেরে দেবার তালে আছ নাকি?' হেসেই বলি।

'না না, যাঃ! অসময়ে এতটা উপকার করেছে। না না, একদিন ফিরিয়ে দিয়ে আসিস গিয়ে।'

কিন্তু এই অনিশ্চিত একদিনের জন্যে অপেক্ষা করার ধৈর্য সুপ্তির ছিল না, সত্যি কথা বলতে কি, আমারও না। কৌতূহল প্রবল। একটা যেন কেমন অবর্ণনীয় অজ্ঞাত সংশয়। পরের দিন সবাই ঘুমিয়ে পড়তে বেলা তিনটে নাগাদ আমরা দুই ভাইবোনে বেরিয়ে পড়লুম টর্চটা নিয়ে।

গিয়ে দেখলুম সে ঘর একেবারে খালি। সেটা এবং তার পাশাপাশি বাকী দুটো ঘরও। কেউ নেই, কিছুই নেই। তথাকথিত বাবার এতটুকু চিহ্ন পর্যন্ত কোথাও খুঁজে পাওয়া গেল না। শুধু সেই প্রথম দিন যে ঘরে তাকে দেখা গিয়েছিল সেই ঘরের কোণে বালির ওপর স্তূপাকার অনেকগুলি আধভাঙা প্রসাদের পাত্র, যেমন হাঁড়ি বা গুণ্ডির আধখানা ভেঙে এদেশে একজনের মতো প্রসাদ দেয় তেমনি, কতকগুলো কালি-ঝুলি মাখা পোড়া হাঁড়ি ভাঙা, কতকগুলো সাদা।

কতদিন ধরে জমেছে এগুলো কে জানে, ফেলেই বা দেয় নি কেন?

এ কি আমাদের দেখাতেই জমানো ছিল এমন ক'রে?

আশপাশের বাড়িতে, সোনার-গৌরাঙ্গে, অন্য মন্দিরে—অনেক খোঁজা হলো। ঐ বর্ণনার চোদ্দ পনেরো বছরের উড়িয়া ছেলেরও খবর কেউ দিতে পারল না। কেউই দেখে নি। কেউ জানেও না।